সুখের সন্ধানে

এম আতাউর রহমান পীর

শাহ আছদ আলী পীর (রহ.) ফাউন্ডেশন

সুখের সন্ধানে # ১

সুখের সন্ধানে
এম আতাউর রহমান পীর

স্বত্ব : নাবিলা মাহজাবিন রিয়া

প্রথম প্রকাশ : ২৬ মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪ জুলাই ২০০৯

প্রকাশক : শাহ আছদ আলী পীর (রহ.) ফাউন্ডেশন
ষোলঘর, সুনামগঞ্জ

অক্ষরবিন্যাস : মো. শাহারুল আলম

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে : চৌধুরী প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ
পশ্চিম সুবিদবাজার, সিলেট

ISBN : 978 -984 -33 -0256 -4

Sukher Sondhaney, by M Ataur Rahman Pir
published by Shah Asod Ali Pir (Rh) Foundation
Shologhar, Sunamganj

Price: Tk 120.00

উৎসর্গ

যাঁরা অন্তরে লালন করেন শান্তিময় বিশ্বের স্বপ্ন–
তাঁদের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১. দ্য ক্রীড অভ্ ইসলাম- অনুবাদ (২০০৬)
   মূল : আবুল হাশিম
২. ইসলাম কালজয়ী জীবনাদর্শ- প্রবন্ধ সংকলন (২০০৭)
৩. জেনারেল ওসমানী- সম্পাদনা গ্রন্থ (২০০৯)
৪. দৈনন্দিন জীবনে মহানবী (সা.) (২০০৯)
   Prophet Muhammad (Sm) in Everday Life
৪. উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন (১৯৮২)
৫. স্নাতক ব্যবহারিক রসায়ন (১৯৮৫)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রকাশের অল্প ক'দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সব কপি নিঃশেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে কোন পরিবর্তন না-করলেও কয়েকজন সুহৃদের পরামর্শে কয়েকটি শব্দচয়নে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

যাঁরা এ পুস্ড়ক প্রকাশের জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন তাঁদের জানাই আন্ড়রিক ধন্যবাদ।

তারিখ **এম আতাউর রহমান পীর**
১৪ জুলাই ২০০৯

নিবেদন

সৃষ্টির শুর“ থেকেই মানুষ সুখের সন্ধানে নিরন্ড়র প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সুখ যদিও আপেক্ষিক বিষয় তবু সুখী হতে চায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। সবাই সুখ চায়, শান্ড়িতে বসবাস করতে চায়। তবে একেক জনের কাছে সুখের সংজ্ঞা একেক রকম। কেউ-বা ভোগবিলাসে সুখ খোঁজেন আবার কেউ সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত থেকে সুখ খোঁজেন। তবে সামগ্রিকভাবে সমাজে যদি ন্যায়বিচার না-থাকে তাহলে সুখী হওয়া যায় না।

বিশ্বে বর্তমানে এক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজমান। সবাই দ্র“ত সুখী হতে চায়। সুখী হওয়ার বাসনায় আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। যা কোনভাবেই সুস্থ সমাজে কাম্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে হলে আমাদের অন্যের সুখের কথা চিন্ড়া করতে হবে। অন্যকে সুখী করতে পারলেই নিজেও সমৃদ্ধ হওয়া যাবে। আর অন্যকে সুখী করতে হলে প্রতিটি মানুষকে ভালো মানুষ হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে হতে হবে বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল।

বিবেকবান মানুষেরা শুধু নিজের জন্য না ভেবে অন্যের মঙ্গল-চিন্ড়া করেন। ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের প্রতি যত্নশীল হন। কিন্ড়ু বিবেককে শাণিত করার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে কৈশোর, তার“ণ্য ও যৌবনকাল। এ বয়সে যদি সুশিক্ষালাভ করা যায় তাহলে কর্মজীবনে তা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব। এ বিবেচনা থেকেই এ দেশের তর"ণ প্রাণে সুখ-স্বপ্নের বীজ বুনে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন সময় এ নিবন্ধগুলো লিখিত হয়েছে। প্রিয়ভাজন ছাত্রছাত্রীর অনুরোধের প্রেক্ষিতেই প্রাথমিকভাবে এ নিবন্ধগুলো রচিত। আর প্রিয়জনদের তাগিদে পুস্ড়কাকারে প্রকাশের উদ্যোগ।

দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে আজ যে হানাহানি তার একমাত্র কারণ আমাদের সংকীর্ণ চিস্ড়া-চেতনা ও কুসংস্কারগ্রস্ড় মানসিকতা। তাই যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটে সংস্কারকের—যারা আমাদের সামনে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। সুখ ও শাস্ড়ির জন্যই প্রয়োজন সংস্কার বা দিন বদলের। দিন বদলের জন্যে প্রয়োজন সংস্কারমনা কিশোর, তর"ণ ও যুবসমাজের। কেননা এরাই দিন বদলের প্রধান সৈনিক। এদেরকে সঠিক দিঙনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেই সমাজে শাস্ড়ি ফিরিয়ে আনাসহ সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। আর সমাজে শাস্ড়ি ফিরে এলেই আমরা সুখী হতে পারব।

দিন বদলের যারা চালিকাশক্তি তাদেরকে আমার নিবন্ধগুলো কতটুকু প্রেরণা জোগাবে জানি না, যদি পাঠককে সুখের সন্ধানে কৌতূহলী বা উৎসাহী করে তোলে, তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক।

এ বইয়ে প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর উৎকর্ষ সাধনে বন্ধুবর অধ্যাপক নীলকান্ড় দে, অধ্যাপক গ.ক.ম আলমগীর, কবি মুহম্মদ আবদুল হান্নান, প্রিয়ভাজন সহকর্মী রজত কান্ড়ি ভট্টাচার্য্য, আমার পুত্র সাইফুর রহমান পীর র"মেল ও প্রিয়ভাজন কবি আবিদ ফায়সাল মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে যে সহযোগিতা দান করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সুখের সন্ধান করতে গিয়ে একজন উচ্ছল প্রাণ যুবকও যদি দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বশাস্ড়ি প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম অবদান রাখে, তাহলেই নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করবো। বিশ্বায়নের এই যুগে সবাই আলোকিত মানুষ হোক, পরিবার, সমাজ ও বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গল হোক; বিশ্বে শাস্ড়ি প্রতিষ্ঠিত হোক—মানুষ সুখী হোক—এ-ই প্রত্যাশা।

এম আতাউর রহমান পীর
প্রিন্সিপাল
২৬ মার্চ, ২০০৯ মদন মোহন কলেজ, সিলেট

সূচিপত্র

০১.	সুনাগরিকের গুণাবলি	০৯
০২.	দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	১২
০৩.	নেতৃত্বের গুণাবলি	১৫
০৪.	বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ	২৩
০৫.	তারুণ্যের সংকট	৩০
০৬.	সুখের সন্ধানে	৩৪
০৭.	মানবিক গুণাবলি ও নেতৃত্ব	৩৬
০৮.	পথশিশুদের প্রতি দায়িত্ব	৪০
০৯	ধর্মীয় সহনশীলতা	৪৩
১০.	তথ্যপ্রযুক্তি	৪৬
১১.	পরিবেশ সংরক্ষণ	৪৯
১২.	শব্দদূষণ	৫৫
১৩.	পানি : বর্তমান শতাব্দীর হাহাকার	৫৮
১৪.	মানবকল্যাণে শিক্ষা	৬৩
১৫.	ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িকতা	৬৬
১৬.	খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প	৭১

সুনাগরিকের গুণাবলি

মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া আমাদের জন্য কতই না সৌভাগ্যের! এটি আল- াহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য আর কোন প্রাণী নেই যাদের বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। স্রষ্টার এ-মহাদানের প্রতিদান দেওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। তবে এ-প্রতিদানের অনেক পথ রয়েছে। প্রত্যেকে সুনাগরিক হয়ে দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা হচ্ছে এর মধ্যে প্রধান।

সুনাগরিক হওয়ার জন্য শিশুকাল থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেননা কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনাতে একটি কাজের অর্ধেকই সম্পন্ন হয়ে যায় বলে জ্ঞানীরা স্বীকার করেন। তাই প্রতিটি মানুষকে সুনাগরিক হওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে ভাবতে হবে আমরা সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করছি কি না? যদি উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে উত্তম আর যদি নেতিবাচক হয় তাহলে তা সংশোধন করতে হবে। বহু লোক আছেন যারা আপাতদৃষ্টিতে অনেক ভালো কাজ করেন কিন্ডু তারা এ কাজগুলো সঠিক পন্থায় করেন না। তারা মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, পাঠাগার ইত্যাদি তৈরি করেন, কিন্ডু এগুলো করতে গিয়ে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ব্যয় করেন। এটি কোন অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না। তাই ভালো কাজটি সৎভাবে অর্জিত সম্পদ দিয়ে করাই একান্ড় কর্তব্য।

সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানের আইনকানুন নিয়মনীতি মেনে চলেন এবং এমন কাজ করেন যেন কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার একজন প্রথিতযশা রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিংকন—যিনি সততা ও একনিষ্ঠতার জন্য চিরদিন স্মরণীয় হয়ে আছেন; তিনি বলেছেন—'আমি আজ যে ভবনটিতে (হোয়াইট হাউস) বসবাস করছি সেজন্য আমি খুবই গর্বিত কিন্ডু আমাকে এমন কাজ করতে হবে যেন আমার বসবাসের কারণে এ ভবনটিও গর্ববোধ করতে পারে'। তাই বলা যায় সুনাগরিক যেখানে কাজ করেন বা যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংশি- ষ্টতা থাকে, সে প্রতিষ্ঠানে তার কাজকর্ম এমন হয় যে, তার কর্মের ফলে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি সাধিত হয়। এটা করতে পারলে একজন ব্যক্তি নিজেকে অবশ্যই সুনাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন–অন্যথায় নয়। তবে প্রতিষ্ঠান বা সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করতে গিয়ে পুষ্পমাল্য পাওয়ার আশা করলে চলবে না বরং তা নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে।

পরকে সতত সাহায্য করা এবং কখনো আঘাত না-করাও সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য। পরকে সাহায্য করার নিমিত্তে সূর্যোদয় থেকেই সুনাগরিককে কাজ করতে হবে– তাহলেই অন্যের ভালোবাসা অর্জন করা যাবে, অন্যরা বন্ধুর মতো আচরণ করবে। কেননা ভালোবাসা দেওয়ার মাধ্যমেই ভালোবাসা অর্জন করা যায়।

সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছাতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা একান্ড় প্রয়োজন। এর উদাহরণ হিসেবে ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ডের নাম উলে- খ করা যেতে পারে– যিনি বিশ্বে প্রথম ওপেনহার্ট সার্জারি করে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী না-থাকার কারণে পড়ালেখা বাদ দিতে চেয়ে তাঁর অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে ভর্তি বাতিলের আবেদন করেন। অধ্যক্ষ ছাত্রের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা দেখতে পেয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন এবং বলেন– 'বাবা তোমার হাতের আঙুলগুলো এতই মসৃণ ও সুন্দর যে এ আঙুলগুলো ব্যবহার করে তুমি একজন ভালো শল্যচিকিৎসক হতে পারো'। অধ্যক্ষের এ উৎসাহবাণীতে ক্রিস্টি নামের সে ছেলেটি তাঁর পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়ালেখা করে বিশ্বের প্রথিতযশা চিকিৎসকে পরিণত হয়। এজন্যে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সঠিক কাজ করার ব্যাপারে তর"ণ ও যুব বয়সেই সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না।

নিজ লক্ষ্যে পৌঁছার পর অন্যরা যাতে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করাও প্রতিটি সুনাগরিকের কর্তব্য। অল্প একটু সাহায্য অন্যকে কীভাবে তার লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। তিনি ছিলেন এক মালির সন্ড়ান। সেই মালি ইংল্যান্ডের এক লর্ডের বাড়িতে কাজ করতেন। সেই সূত্র ধরে লর্ডের পুত্রের সঙ্গে অ্যালেক্সের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একদিন দুই বন্ধু মিলে টেমস নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে লর্ডপুত্রের ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। বন্ধু অ্যালেক্স নিজ জীবন বাজি রেখে লর্ডপুত্রকে নদী থেকে উদ্ধার করে। লর্ডপুত্র বাড়ি এসে বাবাকে এ-দুর্ঘটনার বিবরণ দেয় এবং বলে যে, অ্যালেক্স তাকে উদ্ধার না-করলে তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। এ ঘটনা শুনে বাড়ির মালিক অ্যালেক্সের পিতাকে ডেকে এনে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিতে চাইলেন। কিন্ড়ু অ্যালেক্সের পিতা মনিবকে বললেন: 'জনাব! আমি অর্থ সাহায্য চাই না বরং আপনি যদি সত্যিকার অর্থে আমাকে সাহায্য করতে চান তাহলে আমার ছেলের পড়ালেখার ভার গ্রহণ কর"ন—এতে আমি খুশি হবো।' লর্ড তাতেই রাজি হলেন এবং নিজ পুত্রের সঙ্গে অ্যালেক্স-এর পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন। সেই মালিপুত্র অ্যালেক্স পরবর্তীকালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে জীবন রক্ষাকারী অমূল্য সম্পদ দান করেছেন।

নিজের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞান, মেধা এবং দক্ষতা অন্যকে শিক্ষা দেওয়াও সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য। এতে করে অন্য ব্যক্তিও জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতায় পারদর্শী

হয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনসন বলেছেন: নিজেকে নিজের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র করো, সমাজ তোমাকে শ্রদ্ধা করবে।

নিজ আনন্দে যখন অন্যকে শরিক করা যায় তখন সে আনন্দ যেমন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে তেমনি নিজের জানা ভালো কাজগুলো অন্যকে শিক্ষা দিলে সমাজ উপকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনীশক্তিও বৃদ্ধি পায়। এক গ- াস পানিতে এক চামচ চিনি ছেড়ে দিলে তা যেমন পরিণত হয় সুস্বাদু শরবতে কিংবা একটু ফুলের নির্যাস বাতাসে ছড়িয়ে দিলে তা থেকে যেমন ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধ, ঠিক তেমনি সুনাগরিকের চরিত্র মহত্ব ও আচার-আচরণ অনুসরণের মাধ্যমে তাদের আশেপাশের মানুষও পরিণত হয় নিখাঁদ খাঁটি মানুষে। দুর্নীতিপরায়ণতা, অন্যের ক্ষতি করা এবং অন্যকে প্রতারণা করা অসৎ এবং পাপ কাজও বটে। তাই সুনাগরিক এসব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকেন।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কোন না-কোন প্রতিভা লুক্কায়িত আছে। একজন সুনাগরিক সব সময়ই অন্যের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে সে-টির স্ফুরণ ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন।

মানুষ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি– আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের কর্তব্য অন্যের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ বিশেষত যুবসমাজ যদি নিজের মেধা এবং জ্ঞানকে স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত করে তাহলেই দেশ সমৃদ্ধির চরম সোপানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। মনে রাখা উচিত একজন সুনাগরিক সব সময়ই একটি দেশের অমূল্য সম্পদ। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই উচিত সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। এক কথায় আমাদেরকে শুধু স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেই চলবে না, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, দুর্নীতি প্রতিরোধ

দেশপ্রেম কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। দেশের মাটিকে ভালোবাসা, দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জন্য গৌরববোধ করা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া–এসবই হচ্ছে দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। প্রতিটি নাগরিকের মূল্যবান অলংকার হচ্ছে দেশপ্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম নাগরিকের মধ্যে আপনাআপনি জন্ম নেয় না। বরং গণতন্ত্রের সুষ্ঠুচর্চার মাধ্যমে তা জন্মলাভ করে। জনগণ যখন দেশ পরিচালনায় অংশ নেয় এবং নিজেকে সরকারের অংশ হিসেবে গণ্য করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ যখন রাজকোষ লুণ্ঠন করে শতাধিক নৌযানে করে এদেশের সম্পদ ভোগ করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এদেশের জনগণ নদীতীরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। তারা এর প্রতিবাদ করে নি। কেননা তাদের ভাববার অবকাশ ছিল না যে, এ-সম্পদের মালিক তারা। তারা শাসনযন্ত্রের অংশীদার ছিল না বলে তারা মনে করেছিল এ-সম্পদের মালিক নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাহ। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, এখানে আমাদের নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। এটা ছিল জনগণের মনোভাব। পলাশি যুদ্ধের প্রায় একশ বছর পর যখন এদেশের মানুষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হতে থাকে তখন থেকে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হতে শুর" করে। বিদেশি শাসকদের প্রতি তাদের মনে তখন ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটতে থাকে। পক্ষান্ড়রে তাদের মনে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হতে থাকে, ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মানুষ সংগঠিত হতে সচেষ্ট হয়। তারই ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহের সূচনা ঘটে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। এদেশের মানুষের মনে দেশপ্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বেনিয়া ইংরেজদের কাছ থেকে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্ড়ান নামক দেশের স্বাধীন নাগরিক হলেও তারা প্রকারান্ড়রে পরাধীন থেকে যায়– তাদের মন থেকে যায় অতৃপ্ত। তারা অনুভব করে যে, একই ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জীবনবোধ ভিন্ন। তাই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সময়কাল পর্যন্ড় এদেশের মানুষ ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়ে এদেশের মানুষ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করে। এখন ভাবতেও ভালো লাগে—সেই ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরেই ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত

হয়েছে। এসব প্রতিটি আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকাশে যারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল তারা হচ্ছে এদেশের সুশিক্ষিত যুবসমাজ। কিন্ডু বর্তমানে এ যুবসমাজ কিছুটা দ্বিধান্বিত। কেননা আমরা প্রবীণরা তাদের মন মানসে এ অনুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম হই নি যে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে এবং এ নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যেসব কৌশল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে সে দেশের যুবসমাজকে অকার্যকর ও অকর্মন্য করে তোলা। তাই তো স্বার্থান্বেষী মহল পর্যায়ক্রমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কৌশলে পরমুখাপেক্ষী করছে। যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ড় ও বিকৃতির পথে ধাবিত করে তাদের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষিত করছে। দুর্নীতির বির"দ্ধে তাদের প্রতিরোধ গড়ার শক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করছে– যা কখনো একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাম্য হতে পারে না। তাই আমাদের যুবসমাজকে এদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে এবং এসব কুচক্রিদের প্রতিহত করতে হবে। তাহলেই এ যুবসমাজ যুবশক্তিতে পরিণত হয়ে দেশকে সত্যিকারের একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের বিদেশি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, বরং দুর্নীতি নামক ব্যাধিকে প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে ঘটে যাওয়া অপচয় রোধ করতে হবে। মানব সমাজে দুর্নীতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর দুষ্ট ক্ষত যুগে যুগে মানব সভ্যতার ললাটে কালিমা লেপন করেছে। ঐশিগ্রন্থ তাওরাতে অর্থের বিনিময়ে স্বার্থসিদ্ধির বিষয়কে নির"ৎসাহিত করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, দুর্নীতির গোড়াপত্তন প্রাচীনকাল থেকেই। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস মীর জাফর পত্নীকে তৎকালীন দেড় লক্ষাধিক টাকা ঘুস প্রদান করেছিলেন বলে ইতিহাসে বর্ণিত আছে। সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এদেশের প্রভাবশালীদের দ্বারা অতীতে সংঘটিত দুর্নীতির কাহিনী সকল কল্পকাহিনীকেও হার মানিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে এদেশে প্রায় সকল সরকার দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সূচকে ২০০১ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় বাংলাদেশ পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করেছে। অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে স্বাধীনতার পর হতে বিদেশি ঋণ ও অনুদানের ২ লক্ষ কোটি টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থই দুর্নীতির মাধ্যমে লুঠপাট হয়েছে। বিচার বিভাগ, ভূমি প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগে ঘুস লেনদেনের হার সর্বোচ্চ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হওয়ার পর দুর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দেশ একদিন দুর্নীতিমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে এদেশের সৎ, ন্যায়পরায়ণ যুবসমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন

করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যুবসমাজের মধ্যে যে অফুরন্ড় সম্ভাবনা রয়েছে একমাত্র তারাই নীতি বির"দ্ধ কাজ প্রতিরোধের ক্ষমতা ধারণ ও সংরক্ষণ করে। দুর্নীতির কারণসমূহ অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করে এর প্রতিরোধে যুবসমাজ এগিয়ে এলেই আমাদের মাতৃভূমি অচিরেই ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ার সমপর্যায়ের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

দুর্নীতি একটি সামাজিক অপরাধ। এটি ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ। দুর্নীতি বৈষম্য সৃষ্টি করে ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস করে। সে জন্যেই এ মুহূর্তে দুর্নীতি প্রতিরোধে জর"রি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। আমাদের নির্ভীক যুবসমাজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে এগিয়ে এলেই এ দেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত করা সম্ভব। কেননা হাজার হাজার বছর ধরে একমাত্র যুবশক্তিই সকল দেশের, সকল সমাজের পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। যুবকদের অন্ড়রেই লুক্কায়িত রয়েছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় বিপুল জীবনীশক্তি। দুঃখজনক হলেও একথা অকাট্য সত্য যে, এদেশের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ক্ষমতাধারী রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিরা দেশের যুবসমাজকে নিজের অনৈতিক কাজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দিয়েছেন। আর এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে সারা জাতিকে।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, শিশুকালে মানুষ কিছুই জানে না বলে মা-বাবার মুখাপেক্ষি থাকে, তার"ণ্যে মানুষের কিছুটা জানার সুযোগ হয় আর তার"ণ্যের কারণে কিছু কাজ করাও সম্ভব। যুব বয়সে মানুষ আরও কিছুটা জানতে পারে এবং অনেক কিছুই তার করাও হয়। কিন্ড়ু বৃদ্ধ বয়েসে মানুষের সবকিছুই জানা থাকে—তবে বার্ধক্যের কারণে কিছুই করতে পারে না। তাই যুবক বয়সেই মানুষকে সবকিছু জানতে হবে এবং পৃথিবীর সকল জঞ্জাল দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

নেতৃত্বের গুণাবলি

একজন অদক্ষ বিক্রয় কর্মচারীর নিকট এক ক্রেতা এসে 'সেপায়ার' নামক কলম চাইলে কর্মচারীটি ক্রেতাকে বিনয়ের সঙ্গে জানালো যে তারা 'সেপায়ার' কলম বিক্রি করে না। ক্রেতা চলে যাবার পর মালিক কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে বললেন: ক্রেতাকে এমন জবাব না দিয়ে তোমার এমন বলা উচিত ছিল যে, জনাব আমরা 'সেপায়ার' কলম বিক্রি করি না তবে আমাদের নিকট এরচেয়ে ভালো কলম রয়েছে। সে কলমটি হচ্ছে 'পার্কার'; আপনি ইচ্ছে করলে সেটি ক্রয় করতে পারেন। বোকা কর্মচারী জবাবে বললো : জনাব! ভবিষ্যতে আর এমন হবে না, আমাকে ক্ষমা কর"ন। ঘটনার কয়েকদিন পর অন্য ক্রেতা এসে একই কর্মচারীর নিকট টয়লেট পেপার চাইলেন। বোকা কর্মচারী বলল: 'জনাব, আমাদের নিকট টয়লেট পেপার নেই, তবে আপনি চাইলে এর চেয়ে ভালো পেপার আমি আপনাকে দিতে পারি।' এমন আচরণ অবশ্যই একজন ভালো বিক্রেতার গুণাবলি নয়। এ ধরনের বিক্রেতা যেমন কোন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি করতে পারে না, তেমনি নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়াও একটি সমৃদ্ধ সমাজ বা জাতি গঠিত হতে পারে না।

একজন যোগ্য নেতার যে গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয় তার মধ্যে বিনয়, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ হচ্ছে প্রধান। এগুলোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং একই সঙ্গে নিজ অনুসারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। যিনি এ কাজে যত পারদর্শী হবেন তিনি ততো বেশি দক্ষ নেতা হতে পারবেন। দক্ষ নেতারা দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে সক্ষম। কেননা তারা জানেন জীবনে সঙ্কট থাকবেই এবং সঙ্কটই সুযোগের সৃষ্টি করে দেয়। তবে সঙ্কট মোকাবিলার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা। কয়েক বছর আগে উম্বিলডন টেনিসে ভার্জিনিয়া ওয়েডি নামে এক মহিলা ক্রিস্ট এভার্টকে হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কিন্ডু তাঁর জয়ের পিছনে যে বিষয়টি গোপনে কাজ করেছিল তা ছিল এভার্ট-এর ন্যায়পরায়ণতা। খেলতে গিয়ে এভার্ট যখন একটি বল মেরেছিলেন তখন তা কোর্টের বাইরে চলে যায়। কিন্ডু আম্পায়ারের তা দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তিনি ক্রিস্টির পক্ষে পয়েন্ট ঘোষণা করেন। ন্যায়পরায়ণ ক্রিস্টি তা আম্পায়ারকে অবগত করলেও আম্পায়ার সিদ্ধান্ডে অটল থাকেন। এতে ক্রিস্টি মনঃক্ষুণ্ন হন এবং ন্যায়পরায়ণতার স্বাক্ষর রাখতে গিয়ে পরের বলটিতে এমনভাবে আঘাত করেন যেন বলটি কোর্টের বাইরে চলে যায়। ফলে তিনি হেরে যান। এতো বড় একটি খেলায় হেরে গিয়েও ক্রিস্টি তাঁর আজীবন লালিত ন্যায়পরায়ণতাকে বিসর্জন দেন নি।

মিশেল রোকার্ড যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে বিনাসুদে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী না হলে তাঁর বন্ধু তাঁকে বিনাসুদে টাকা ধার দিতেন না বলে জনগণ যখন বলাবলি শুরু করলো তখনই তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন।

মনে রাখতে হবে, জ্ঞান ও সততা ছাড়া নেতা হওয়া যায় না। নেতৃত্ব গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যান্য যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে:

১. একাগ্রতা : মহাভারতে বর্ণিত রয়েছে, স্বয়ংবর সভায় মহাবীর অর্জুন একমাত্র একাগ্রতার জন্যই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন। একাগ্রতা বলতে কোন এক বিশেষ বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করা বোঝায়। দ্রুপদ রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল, যে রাজপুত্র উপরে রক্ষিত একটি মাছের চোখ নিচের জলে মাছের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভেদ করতে পারবে, কন্যা দ্রৌপদীকে তারই হাতে সম্প্রদান করবেন। একে একে উপস্থিত সকল রাজপুত্র লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হবার পর অর্জুন ধনুক হাতে নিচের জলের দিকে তাকিয়ে তির ছুড়ে মাছের চোখ ভেদ করলেন। কীভাবে এ অসম্ভব লক্ষ্য ভেদ করলেন অর্জুনকে সে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মাছের চোখ ভেদ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই লক্ষ্য ভেদ করার সময় তিনি মাছের চোখ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখতে পান নি। ফলে লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব হয়েছিল। এটা হলো একাগ্রতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এভাবে যেকোন কাজে একাগ্রতা অবলম্বন করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

২. দক্ষতা : নেতৃত্ব গ্রহণে আগ্রহীকে সকল কাজে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। কেননা কাজে দক্ষতা অর্জন করলে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। তবে দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত চর্চার কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব বরেণ্য ভায়োলিন বাদক ইয়াহুদ ম্যানহেম নিয়মিতভাবে চার ঘণ্টা বেহালা বাজাতেন। কৌতূহলবশত এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন : জনাব! আপনি তো বিশ্বের নামকরা ভায়োলিন বাদক, আপনি প্রতিদিন এতো দীর্ঘক্ষণ বেহালা বাজানো চর্চা করেন কেন? তিনি বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন: আমি যদি একদিন অনুশীলন বন্ধ রাখি তাহলে ভায়োলিনের তারগুলো বুঝতে পারবে যে আমি অনুশীলন করি নি, যদি দু দিন অনুশীলন না করি তাহলে আমার বিবেক আমাকে বলে দেবে যে আমার চর্চার অভাব রয়েছে আর এক নাগারে তিনদিন অনুশীলন না করলে আমার শ্রোতারাও বুঝতে পারবে যে আমার চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানী বেহালা বাদকের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই।

৩. প্রচেষ্টা : একজন দক্ষ নেতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন কাজের জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে এক সময় নিজ গন্ড়ব্যে পৌঁছা সম্ভব। টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি তৈরির জন্য বারবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি যখন ৮০০ বার ব্যর্থ হলেন তখন তার সঙ্গীরা বলল : টমাস! আমরা কোথায় আছি, তুমি কি বলতে পার? তিনি খুব শান্ড়ভাবে জবাব দিলেন আমরা এখনো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছি, তবে আমরা সেই ৮০০টি পন্থার কথা জানি যেগুলো অবলম্বন করলে বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করা সম্ভব হবে না। অতঃপর ৮০১ পন্থা অবলম্বন করে তারা বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন। তাই দক্ষনেতা হওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। কেননা প্রচেষ্টাই একজন ব্যক্তিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

৪. ভালো শ্রোতা হওয়া : বেশি শোনা ও কম বলা হচ্ছে একজন যোগ্য নেতার বৈশিষ্ট্য। রানি ভিক্টোরিয়ার সময়কার এক প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন বলেছেন : সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে একজোড়া কান দিয়েছেন এবং একটিমাত্র মুখ দিয়েছেন। আর ওই একটিমাত্র মুখও একজোড়া ঠোঁট এবং ৩২টি দাঁত দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন যেন আমরা কম বলি আর বেশি শুনি। তাঁর এ বক্তব্য থেকে ভালো শ্রোতা হওয়ার গুর"ত্ব অনুধাবন করা যায়।

৫. নিজেকে জানা: একজন দক্ষনেতার সব সময়ই নিজেকে জানার প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে নিজেকে জানতে পারার মতো কৃতিত্ব অন্য কিছুতে নেই। তাই সক্রেটিস বলেছেন: নিজেকে জানো।

৬. অল্প কথায় স্পষ্ট বলা: অল্প কথায় স্পষ্ট করে বলা একজন দক্ষনেতার বৈশিষ্ট্য। কথিত আছে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা অনুশীলন করতেন। যুদ্ধযাত্রী নৌসেনাদের উদ্দেশে তিনি তাঁর জীবনের স্বল্পতম ভাষণে বলেছিলেন, Never, Never, Never quit অর্থাৎ 'কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো না।' তাঁর এ স্বল্পতম ভাষণের ফলে ইংল্যান্ডের সৈনিকদের মনে এমন মনোবল সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।

৭. নিজের দ্বারা যা করা হয় না তা অন্যকে করতে না বলা: দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এমন অবস্থা যে আমরা প্রায় সময়ই এমনসব উপদেশ দিই যা আমরা নিজেরা করি না। কিন্ড়ু নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো তা করেন না। এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের একটি ঘটনার উলে- খ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। একদা এক গরিব বৃদ্ধা তার পুত্রকে নিয়ে মহানবীর (সা.) নিকট এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল- াহ (সা.)! আপনি আমার পুত্রকে মিষ্টি কম খেতে উপদেশ দিন;

কেননা আমি এক গরিব মহিলা এবং তাকে মিষ্টি কিনে দেবার সামর্থ আমার নেই। মহানবী (সা.) বললেন: মা আপনি এক সপ্তাহ পরে আসুন, আমি তখন আপনার পুত্রকে উপদেশ দেব। নির্ধারিত দিনে বৃদ্ধা পুনরায় মহানবীর (সা.) নিকট এলে তিনি সেই পুত্রকে মিষ্টি কম খেতে উপদেশ দিলেন। বৃদ্ধা স্বভাবতই ভেবেছিলেন মহানবী হয়তো এমন কিছু করবেন যাতে তার পুত্র মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু মহানবীর কথা শুনে বৃদ্ধা বিস্মিত হলেন এবং মহানবীকে প্রশ্ন করলেন: ইয়া রাসুলুল- াহ (সা.)! এ কথা তো আপনি সেদিনই বলে দিতে পারতেন, তাহলে আমাকে কষ্ট করে আজ আর আসতে হতো না। জবাবে মহানবী (সা.) যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন: মা। আমি নিজেও মিষ্টি পছন্দ করি। তাই গত এক সপ্তাহ আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি এবং একটুও মিষ্টি খাই নি। এজন্যই তো আপনার পুত্রকে আমি মিষ্টি না খাওয়ার নির্দেশ দিতে পারছি। নিজে যা করি না তা অন্যকে করতে বললে সে কি তা করবে? মহানবীর এ শিক্ষা একজন দক্ষনেতার সব সময়ই মনে রাখা উচিত। প্রাচীন উপাখ্যানে বর্ণিত আছে– একদা এক ব্যক্তি তার যৌবনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান! আমাকে এমন শক্তি দাও, আমি যেন সারা বিশ্বের মানুষকে ভালোমানুষে পরিণত করতে পারি। তিনি তার পৌঢ়ত্বে এসে দেখলেন, একজন মানুষকেও তিনি ভালোমানুষে পরিণত করতে পারেন নি। তখন তিনি পুনরায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন: হে ভগবান! আমাকে এমন শক্তি দাও, আমি যেন অন্তত আমার আশপাশের মানুষজন এবং পরিবারের সকলকে ভালোমানুষে পরিণত করতে পারি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লক্ষ করলেন, তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তখন তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি যদি যৌবনে এই প্রর্থনা করতাম যে, হে প্রভু! আমাকে এমন শক্তি দাও, যেন আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারি তাহলে হয়তো আমার নিজের কর্মের মাধ্যমে অন্যকে ভালো মানুষে পরিণত করতে পারতাম।

৮. সেবা : দুঃখী ব্যক্তিকে সেবা করা এবং নিজেকে উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। একজন যোগ্যনেতাকে এমনভাবে কাজ করতে হয় যেন উপকৃত ব্যক্তি বুঝতে পারে যে ওই কাজটি তার জন্য নিঃস্বার্থভাবেই করা হচ্ছে। এখানে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের একটি ঘটনা উলে- খ করার মতো। তিনি একবার ট্রেনে কোথাও যাচ্ছিলেন। ট্রেনে ওঠার সময় তাঁর এক পায়ের একটি সেন্ডেল খুলে পড়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্য পায়ের সেন্ডেলটি খুলে পূববর্তী সেন্ডেলের পাশে ফেলে দেন। তাঁর সঙ্গীরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: এই একটি

সেন্ডেল আমার কোন প্রয়োজনে আসবে না। তাই এই সেন্ডেলখানা ফেলে দিলাম যাতে করে একসঙ্গে দুটি সেন্ডেল পেয়ে কেউ কাজে লাগাতে পারে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ড়।

৯. ধৈর্য: ধৈর্য একজন মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহম লিংকনের বয়স যখন ২১ বছর তখন তিনি ব্যবসায় বিফল হন। ২২ বছর বয়সে স্থানীয় নির্বাচনে পরাজিত হন; পরবর্তীকালে ৩৪, ৪৫, ৪৭ এবং ৪৯ বছর বয়সেও তিনি বিভিন্ন নির্বাচনে পরাজিত হন। কিন্ড়ু তিনি ধৈর্যসহকারে এগুতে থাকেন এবং তাঁর বয়স যখন ৫২ বছর তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

একইভাবে গ্রিস দেশের ডমেসটাস নামক এক তোতলা ব্যক্তি আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে কেবল চেষ্টার ফলে বিশ্বের সেরা বাগ্মীতে পরিণত হয়েছিলেন। সাফল্যের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কোন বিকল্প নেই, একথাটি মনে রাখলে যে কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে একজন দেশনায়কে পরিণত হতে পারবে।

আমেরিকার Tom Whittakar হচ্ছেন একজন পঙ্গু ব্যক্তি। কিন্তু তিনি পর পর তিনবার চেষ্টা করে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এভারেস্টের চূঁড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হন।

১০. সহিষ্ণুতা : সহিষ্ণুতা হচ্ছে মানুষের এমন এক গুণ যার ফলে সে অন্য মানুষের কাছে সম্মানীত হতে পারে। যারা অন্যের কাছে সম্মানীত তারাই প্রকৃত নেতৃত্বের অধিকারী। যাদেরকে জনগণ সম্মান করে না তারা প্রকৃত অর্থে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য নয়। এক ঋষি প্রতিদিন একবার গঙ্গাজলে গোসল করতেন। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান শেষ করে তীরে ওঠার পরই এক দুরাচার ব্যক্তি তাকে ছুঁয়ে ফেলল। সে সময় ছিল প্রচন্ড শীতকাল। কিন্ড়ু সূচি অর্জনের জন্য ঋষিকে তখনই পুনরায় গোসলের জন্য গঙ্গায় নামতে হলো। এভাবে সেই দুষ্ট লোকটি গঙ্গাস্নানের পর বার বার তাঁকে ছুঁতে লাগলো এবং তিনিও বার বার স্নান করতে লাগলেন। এভাবে সেই ঋষিকে প্রচন্ড শীতে বিশবার গোসল করতে হলো, কিন্ড়ু দুষ্ট লোকটিকে তিনি কিছুই বললেন না। ঋষির এ সহিষ্ণুতা দেখে দুষ্ট লোকটি তাকে প্রশ্ন করলো: আমি আপনাকে এতো কষ্ট দিলাম অথচ আপনি আমাকে কিছুই বললেন না, এর কারণ কী? তিনি বললেন: বাবা, অন্যান্য দিন আমি একবারই গঙ্গাস্নান করে পুণ্য অর্জন করি। কিন্ড়ু আজ তোমার কারণে আমি বিশবার গঙ্গাস্নান করে বিশগুণ পুণ্য অর্জন করতে পেরেছি। এটাতো আমার বিরাট পাওনা। ঋষির এ সহিষ্ণুতায় দুষ্ট ব্যক্তি খুবই ব্যথিত হলো

এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে ধিকৃত করতে লাগলো। এটা হলো সহিষ্ণুতার শুভ ফল। তাই সকলকে সহিষ্ণু হয়ে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা একান্ড় বাঞ্ছনীয়।

১১. অধীনস্থের প্রতি সদ্ব্যবহার : পৃথিবীতে সকলের অবস্থা সমান নয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত প্রভৃতির কারণে কেউ প্রভু আর কেউ ভৃত্য। তাই সৎ গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তির উচিত অধীনস্থদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। যদি কোন ব্যক্তি তার অধীনস্থকে হেয় জ্ঞান করে, তাহলে এটাই প্রকাশ পায় যে, তিনি নেতৃত্ব গ্রহণের অনুপযোগী।

১২. পরিশ্রমী হওয়া: সংসারের যাবতীয় ভালো বস্ড়ুই শ্রমলভ্য। তাই পরিশ্রম ছাড়া ভালো কিছু লাভ করার উপায় নেই। পরিশ্রম না করলে যেমন জমিতে ফসল ফলে না বা কার্পাস থেকে সুতা হয় না, তেমনি পরিশ্রম না করলে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। যে দেশের লোক যত বেশি পরিশ্রমী তাদের অবস্থা তত উন্নত। পৃথিবীর মধ্যে জার্মান, সুইস, ইংরেজ ও আমেরিকানরা অধিক পরিশ্রমী। তাই তাদের অবস্থা সকল জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১৩. স্বাবলম্বী হওয়া : মানুষমাত্রই জীবিকানির্বাহের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তবে এজন্য অন্যের আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অন্যের ওপর নির্ভর না করে স্বীয় পরিশ্রমে জীবিকানির্বাহ করতে পারে, সে সব লোকের নিকট প্রিয়। নিজের কাজ নিজে করলে ইহা যত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে অন্যের ওপর এর দায়িত্ব প্রদান করলে হয়তো সে কাজটি ততটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। অতএব যে কাজ আমি নিজেই করতে পারি, সে কাজের দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করা কখনো উচিত নয়।

১৪. প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব : বিপদে পড়লে প্রতিবিধানের জন্য সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তার মোকাবিলা করা উচিত। অনেকে বিপদে পড়লে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফলে তারা আত্মরক্ষার কোন উপায় বের করতে পারে না। এমন হলে বিপদের অবসান না হয়ে বরং বিপদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ একজন দক্ষ নেতার জন্য অপরিহার্য।

১৫. নিরহঙ্কার : নেপোলিয়ান বেনাপোর্ট ছিলেন ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখে ফ্রান্সের লোকেরা এক সময় তাঁকে সে দেশের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করে। কিন্ড়ু তিনি ছিলেন অহঙ্কারী। তাই ফ্রান্সের সম্রাটের পদ পেয়েও তিনি সন্ড়ুষ্ট হলেন না। তাঁর ইচ্ছে হলো সারা পৃথিবীর সম্রাট হবার। তাই তিনি ইউরোপের অনেক রাজাকে পরাজিত করে সেইসব রাজার রাজ্য নিজ অধিকারে

আনলেন। তাঁর (নেপোলিয়ানের) এমন কা" দেখে ইউরোপের রাজারা জোটবদ্ধ হয়ে নেপোলিয়ানের মোকাবিলা করে তাঁকে পরাজিত করলেন এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে কারার"দ্ধ করে রাখলেন। অতঃপর সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি যদি অহঙ্কার ত্যাগ করে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে নিজেকে সন্ডুষ্ট রাখতে পারতেন তাহলে হয়তো তাঁর এ পরিণতি হতো না!

১৬. বিনয় : বিনয় যেমন সদগুণের শোভাবর্ধন করে, তেমনি আত্মপ্রশংসা অন্যের নিকট ঘৃণিত হয়। নিজেকে সব সময় জ্ঞানী বা বড় মনে না করে সব সময় নিজেকে ছোট মনে করা ও জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট হওয়া বিনয়ীর লক্ষণ। কারো যে বিদ্যা বা জ্ঞান নেই যদি সেই জ্ঞান বা বিদ্যা আছে বলে যদি অন্যকে ধারণা দেওয়া হয় তাহলে অন্য লোকের নিকট ঘৃণিত হতে হয়। কেননা মূর্খতাকে লোকেরা অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারে। গুণহীন ব্যক্তিকে যতটুকু না ঘৃণা করা হয় কপট ব্যক্তিকে তার চেয়েও বেশি ঘৃণা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। বিনয়ী ব্যক্তি যেকোনো কাজে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকে। অনেকেরই এরূপ বিশ্বাস যে তার মত বা সিদ্ধান্ড়ই অভ্রান্ড় এবং অন্য ব্যক্তির মত বা সিদ্ধান্ড় ভ্রান্ড়। এটা একটা রোগ। একজন দক্ষ নেতাকে এ রোগের প্রতিকারে যত্নশীল হতে হবে। মানুষমাত্রই ভুল করতে পারে তাই কারো সিদ্ধান্ড়ে ভুল থাকবে না এটা কখনো চিন্ড়া করা ঠিক নয়। ভুল হলে তার সংশোধন করতে হবে। ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে এক শ্রেণীর লোকেরাই কখনো ভুল করে না–তারা হচ্ছে যারা কখনো কোন কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে না। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ মানুষের যে দশটি গুণাবলির উলে- খ করেছেন তার প্রথমটিই হচ্ছে বিনয়।

১৭. দুর্নীতি প্রতিরোধ : এই মুহূর্তে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতি আমাদের উন্নয়নকে ব্যাহত করার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত দরিদ্রতর অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সমাজে অবিচার বাড়ছে। দুর্নীতির ফলে এদেশের নারীসমাজ বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে কেননা আমাদের সমাজে ছেলেসন্ড়ানকে দেখা হয় সচ্ছলতা ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে এবং কন্যাসন্ড়ানকে দেখা হয় অসচ্ছলতার প্রতীক হিসেবে। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিবার থেকেই শুর" হয় নারী-পুর"ষের বৈষম্য। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ গুর"ত্বপূর্ণ মৌলিক খাতে দুর্নীতির কারণে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তার নাগরিক অধিকার থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। যেসব দেশে নারীশিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশি সেসব

দেশে দুর্নীতির হার কম বলে প্রমাণিত হয়েছে। সিঙ্গাপুরে নারীশিক্ষার হার প্রায় ৯০% এবং সেখানে দুর্নীতির মাত্রা খুব কম। অপরদিকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার হার মাত্র ৩৩% এবং এখানে দুর্নীতির মাত্রা কল্পনাতীতভাবে বেশি।

সাফল্যের জন্য জীবন দেওয়া এবং অন্যায়ের বির"দ্ধে বুক পেতে দাঁড়ানো তার"ণ্যের ধর্ম। তর"ণরা যুগ যুগ ধরে শিকল ভাঙার গান গেয়েছে এবং শিকল ভেঙেছে। কিন্ডু বর্তমানে আমরা ভালো মানুষেরা (!) কোন এক অজ্ঞাত কারণে এ শিকল ভাঙার গান গাইতে পারছি না। আমরা নীরবতা অবলম্বন করছি। এ নীরবতা আমাদের কাম্য নয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের যুবশক্তিকে, আমাদের তার"ণ্যকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন : সামাজিক ন্যায়বিচারের সবচেয়ে বড় শত্র" নীরবতা। তাই অন্যায়ের বির"দ্ধে নীরবতা অবলম্বন পরিহার করতে হবে।

মানবতার কল্যাণ চিন্ড়াই হচ্ছে নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় গুণ। মানবতার কল্যাণের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকেই নিজের চাহিদার চেয়ে অন্যের চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নিজ সমস্যা সমাধানের আগে অন্যের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই হবে যোগ্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ

আমরা ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। সুপারসনিক গতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে এতো দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে যে, বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী হাতের মুটোয় চলে এসেছে। এমনকি আমরা সকালে আমেরিকায় বসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নাস্ড়া সেরে সন্ধ্যায় বা রাতে বাংলাদেশে নিজ বাসায় পরিবার পরিজন নিয়ে খাবার খেতে পারছি। চিঠিপত্র এর চেয়েও অনেক দ্রুত গতিতে চলতে পারে। ই-মেইলের সাহায্যে একটি চিঠি মাত্র কয়েক সেকেন্ডে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছায়। প্রযুক্তির এমনই উন্নয়ন ঘটেছে যে, যেসব বই সংরক্ষণ করতে ৮ কিংবা ১০টি আলমিরার প্রয়োজন হতো তা এক বা দুটো ফ্লপি ডিস্কে আমরা সংগৃহিত করে রাখতে পারছি।

বর্তমান সময়ের মানুষেরা যারা প্রযুক্তিগত এ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারবে- তারা বিশেষত তরুণেরা খুবই ভাগ্যবান। তাদের জন্য রয়েছে জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তিকে আয়ত্ব করে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আইটি বিদ্যা ও ইংরেজি বিষয়ের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশের আইটি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক ভীত মজবুত করছে। অথচ আমাদের দেশে প্রায় সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়টি পড়ানোর পরও আইটি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমরা কোন ভূমিকা রাখতে পারছি না। এ বিষয় নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে অশান্ড় রয়েছে। বিভিন্ন দেশের পারমাণবিক বোমা অসহায় মানুষের আতঙ্কের কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। পারমাণবিক বোমার এই আতঙ্ক নিয়ে বিশ্বের মানুষ শান্ড়িতে বসবাস করতে পারে না। অশান্ড় বিশ্বে শান্ড় ফিরিয়ে আনার জন্য যুবশক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্দেহপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে একে অন্যে আন্ড়রিকতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কেননা বিশ্বের প্রতিটি মানুষ শান্ড় চায়। কিন্ড়ু অন্যকে অসুখী রেখে শান্ড় লাভ করা সম্ভব নয়। ধনীকে গরিবে পরিণত করে যেমন গরিবের উন্নয়ন কামনা করা ঠিক নয় তেমনই পৃথিবীর এক অংশের মানুষকে অভুক্ত রেখে, দারিদ্র্যসীমার নিচে রেখে অন্য অংশের মানুষকে সুখী করার চিন্ড়া বাতুলতা।

সুখ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে সুখম। 'খম' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশী। তাই সুখম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশির সুখ। সুতরাং বলা যায় সুখ প্রতিবেশীর সুখের ওপর নির্ভরশীল। নিজে সুখী হতে হলে প্রতিবেশীকে যেমন

সুখী হতে সাহায্য করা উচিত একইভাবে একটি রাষ্ট্রের সুখের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সুখের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। দেশের প্রতিটি নাগরিকের যদি এ বোধ জাগ্রত হয় তাহলে সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব সমাজে শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে। তবে এ সুখের জন্যে আমাদের যেসব প্রতিকূলতার বির"দ্ধে কাজ করা একান্ড় জর"রি হয়ে দেখা দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

১. অশিক্ষা : শিক্ষা জাতির মের"দ"। শিক্ষার মূলভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। অথচ আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা মোটেও সুখকর নয়। দেশে পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। তাদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্কুলে যায় না। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিটি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিশুদেরকে উপার্জনে নিয়োজিত করা হয়। ফলে এ শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। হিসেব করে দেখা গেছে, নবম শ্রেণীতে যেসব ছেলেমেয়ে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের শতকরা ৪৮-৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না। এতে করে দেশের অর্থের অপচয় হচ্ছে। দেশ প্রতিনিয়ত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এমন অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত যুবসমাজ এ-ব্যাপারে এগিয়ে এলে এ-অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ সম্ভব। নিরক্ষর লোক ও অন্ধলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা লাঞ্ছনার ও গঞ্জনার শিকার হয়। এজন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

২. নেশা : নেশা বর্তমান বিশ্বে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী শুধু তামাকের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ৩০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ প্রতি ১০ সেকেন্ডে ১ জন লোক তামাক আসক্তির কারণে মারা যায়। মাদকাসক্তির কারণে বিশ্বে প্রতিবছর যে পরিমাণ কিশোর ও যুবক মৃত্যুবরণ করে তার পরিমাণ একেবারে নগণ্য নয়। মাদকের প্রতি বর্তমানে শিশুদের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিরীক্ষায় দেখা গেছে সেদেশে যে পরিমাণ যুব ও কিশোর আত্মহত্যা করে তাদের শতকরা ৭০ জনই ড্রাগ আসক্ত। উদাহরণস্বরূপ মহামতি আলেকজান্ডারের কথা বলা যায়। তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে প্রায় সারা বিশ্বকে জয় করেছিলেন। কিন্ড়ু অধিক মদ্যপানজনিত কারণে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ-মর্মান্ড়িক এতিহাসিক ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া একান্ড় কর্তব্য। ড্রাগ আসক্তি থেকে জন্ম নেয় অবৈধ যৌন সম্পর্ক। এ অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে তর"ণদের মাঝে বিস্ড়ার লাভ করছে এইডস রোগের ভয়ানক ভাইরাসের। যার একমাত্র পরিণাম হচ্ছে

মৃত্যু। এ-কঠিন আসক্তি থেকে আমাদের তর"ণ ও কিশোর প্রজন্মকে রক্ষা করা একান্ড় জর"রি হয়ে দেখা দিয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বয়োসন্ধিক্ষণে যে পরিবর্তন দেখা দেয় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে তর"ণরা এসব অবৈধ কাজে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে তাদেরই বয়সের অন্য সচেতন তর"ণ সহযোগীকে উদ্ধারকর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. জনসংখ্যাধিক্য : বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অকল্পনীয়। যদিও সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তথাপি অশিক্ষার কারণে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। একই অবস্থা এশিয়ার দেশসমূহের। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেখানে বিশ্বের লোকসংখ্যা ছিল ২০ কোটি। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তা হয়েছে ৫০০ কোটি আর বর্তমানে (২০০৯ খ্রি.) তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৫০ কোটি। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। কেননা ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০ ভাগ মাটি আর ৭০ ভাগ পানিতে পরিপূর্ণ। এ মাটির পরিমাণ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই কর"ণ। এ সমস্যার উত্তরণ ঘটাতে হলে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামের নিরক্ষর লোকদের বোঝাতে হবে, তাদের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, প্রতিটি সন্ড়ানকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার একান্ড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এছাড়া অধিক জনসংখ্যার কারণে অপরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে উঠছে। যা সৃষ্টি করছে নানামুখি সংকটের।

৪. মরণব্যাধি : আমরা প্রযুক্তিগতভাবে যতই এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের মাঝে দিন দিন নতুন নতুন মরণব্যাধী দেখা দিচ্ছে। ক্যান্সার, হেপাটাইটিস বি ও সি, টিবি, এইডস ইত্যাদি রোগ ধেয়ে আসছে মানুষের দিকে। মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে যতই এগিয়ে যাচ্ছে পরিবেশের ততই বিপর্যয় ঘটছে আর পরিবেশ এরই বদলা হিসেবে মানুষের মাঝে এসব মরণব্যাধি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এইডস এর কারণে আফ্রিকার দেশসমূহে শিশু মৃত্যুসহ মৃত্যুর হার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহেও এইডস রোগ মহামারির আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। আমাদের দেশে যদিও এইডস রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে নি তথাপি আমাদের চিন্ড়ামুক্ত থাকার কোন কারণ নেই। বিশুদ্ধ পানির অভাবে আমাদের দেশে পানিবাহিত মারাত্মক রোগসমূহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় আর্সেনিক দূষণ দেখা দিয়েছে। এসব রোগের কোন প্রতিকার নেই। আছে একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে দেশ থেকে এসব মরণব্যাধিকে দূর করা সম্ভব।

৫. অবৈধ যৌনাচার : বর্তমান সময়ে তরুণ বয়সে যৌনাচার প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। বয়োসন্ধিক্ষণে কিশোর ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হয়। টেলিভিশনে খোলামেলা প্রোগ্রাম দেখে, নীল ছবি দেখে বা কুরুচিপূর্ণ পত্রপত্রিকা পড়ে শিশু কিশোররা যৌনাচারে মেতে ওঠে। এ ধরনের অবৈধ যৌনাচারের কারণে শিশু-কিশোররা নানা ধরনের অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশ ও সমাজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ-সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষিকার মাধ্যমে বয়োসন্ধিক্ষণে পরিবর্তনশীল যৌন অবস্থার উপর সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সহপাঠীদের মধ্যে বয়োসন্ধিক্ষণিক যৌন শিক্ষা প্রদান করতে পারে। এবং এর মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা অনৈতিক যৌনাচার থেকে যেমন রক্ষা পাবে তেমনি অনেক যৌন রোগব্যাধি থেকেও রক্ষা পাবে।

৬. নারীর ক্ষমতায়ন : বর্তমান যুগেও প্রায় সারা বিশ্বজুড়েই নারী ও শিশুরা অবহেলিত। উন্নত দেশ বলে আমরা যা বুঝে থাকি সেসব দেশেও নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাচ্ছে না। অথচ বিশ্বে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কোন কোন দেশে নারীরা পুরুষের মতো পেশাগ্রহণ করলেও দেখা যায় পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষদেরকেই সেসব দেশেও প্রধান ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা আরও নিম্নমুখি। নারীদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়—একথা আজ প্রায় সকলের নিকটই বোধগম্য। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অনগ্রসরতার কারণে পারিবারিক উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হচ্ছে না। নারীর ক্ষমতায়ন না ঘটলে এ দেশের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা সম্ভব হবে না। তাই নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে যুব সম্প্রদায়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশের অর্ধেক নারীসমাজের উন্নয়ন যথাযথভাবে না ঘটলে ভবিষ্যতে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে।

৭. ক্ষুধা ও দারিদ্র্য : বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যাবহুল দেশ। এদেশের ওপর দিয়ে প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি একটি নৈমিত্তিক বিষয়। প্রতিবছর লাখ লাখ টন খাদ্যদ্রব্য আমাদের আমদানি করতে হয়। এছাড়াও স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঘুস-দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছিল। এ দুর্নীতির কারণে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে পাচার হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগণ দরিদ্র থেকে আরও

দরিদ্র হচ্ছে—অপরদিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ছে। কাজের অভাবে বা চাকরির অভাবে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বেকারত্বের জীবনযাপন করছে। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার কারণে ডিগ্রি অর্জন করে কেরানি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এসব লোক উৎপাদনশীল জনসম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে না। লাখ লাখ মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এসব মানুষজনের কাজের কোন দক্ষতা না-থাকার কারণে বিদেশে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমরা যদি আমাদের নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষার আলো দেখাতে পারি, দেশের শতভাগ মানুষকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, যদি অদক্ষ শ্রমিককে বিদেশের শ্রমবাজারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে আমাদের দেশের বিপুল জনমানব জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে। দেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর হবে। গৃহহীন ও বস্ত্রহীন মানুষ সচ্ছল মানুষ হিসেবে এ-সমাজে বসবাস করে আমাদের দেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো অবস্থানে নিয়ে যাবে। এ কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে তারা হচ্ছে এদেশের যুবসমাজ। সকল অনিয়ম, সকল বাধা দূর করার একমাত্র নিয়ামক শক্তি হচ্ছে যুবশক্তি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের যুবসমাজ তাদের মাঝে যে সুপ্ত অফুরন্ত শক্তি রয়েছে তার সম্যক প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশের উন্নয়নে এরাই জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়বে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৮. ভীতি : কর্মভীতি বা অসফলতায় ভীতি একটি রোগ। ভীতিজনিত কারণে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি না। কিন্তু মনে রাখা বাঞ্ছনীয়— তারাই কখনো অসফল হয় না যারা কখনো কাজের জন্য উদ্যোগী হয় না কিংবা কোন কাজ শুরু করে না। তাই সফলতা নাও আসতে পারে এই ভেবে উদ্যোগ গ্রহণ না করাটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। জীবনে উন্নতি করতে হলে ভীতিকে জয় করতে হবে। ভীতি জয় করার প্রধান উপায় হচ্ছে নিজের মধ্যে অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করা। সব সময় ভাবতে হবে আমার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা আছেন, আমার মাঝে অপরিমিত শক্তি আছে—সে শক্তির বলে আমি সকল অপারগতাকে জয় করতে পারব। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমাদের আইকিউ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত থাকে। চেষ্টা করলে হয়তো সামান্য বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। কিন্তু আমাদের অন্তরে যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাকে আমরা সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে সকল ব্যর্থতাকেই আমরা সফলতায় পরিণত করতে পারব।

স্কাউটরা যখন তাঁবু জলসা করেন তখন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বালানোর আগে নিজের অন্ড়রের মধ্যে আগুন জ্বালাতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। কেন তা করা হয়? এর কারণ হচ্ছে, একজন ব্যক্তি যদি তার জীবন সম্পর্কে, তার কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে, তার ভবিষ্যতের উন্নতি সম্পর্কে উৎসাহিত না-হয় তাহলে অপর ব্যক্তি কি কখনো তার ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে এগিয়ে আসবে? অবশ্যই না। তাই সকল প্রকার ভীতিকে জয় করতে না পারলে নিজের জীবনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

৯. শিশুদের বিপৎসংকুল অবস্থা : বর্তমান সময়ে বিশ্বের কোটি কোটি শিশু বিপৎসংকুল অবস্থায় বসবাস করছে। এর পিছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত কারণ রয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে অল্প বয়সেই শিশুদেরকে বিপৎসংকুল কাজে যোগ দিতে হয়। দরিদ্র পিতামাতা তাদের সাময়িক আর্থিক সচ্ছলতার জন্য শিশুদেরকে এমনসব কাজে নিয়োজিত করেন যেখানে তাদের জীবন হয় বিপদাপন্ন। যদিও বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিশুশ্রম নিষিদ্ধ তথাপি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুশ্রম বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে শিশু যেমন বিপদাপন্ন অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করছে—একই সঙ্গে দেশের হাজারো শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে শিক্ষাক্ষেত্রেও দেশ দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে।

উন্নত সমাজে দারিদ্র্য যদিও অনুপস্থিত কিন্ড়ু পিতামাতা উভয়ের চাকরিজনিত কারণে সেখানে শিশুরা তাদের ভালোবাসা থেকে এবং Proper care থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তারা insecure feel করে এবং তারা মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগে। এ শিশুরা কোন কোন ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধি হিসেবে চিহ্নিত হয়। যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিশুদের গভর্নেস বা বাড়ির কাজের লোকদের হেফাজতে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও এসব শিশু পিতামাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এসব শিশুও মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগে বা কিশোর অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে সমাজকে কলুষিত করে। তাই দেখা যায় অনুন্নত বা উন্নত যে সমাজই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই শিশুরা বিপৎসংকুল অবস্থায় বসবাস করছে। কিন্ড়ু আমরা সুস্থ মানুষেরা তা হতে দিতে পারি না। তাই আমাদের উচিত আমাদের প্রতিবেশীর যেসব শিশু এমন বিপৎসংকুল অবস্থায় আছে তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে কাছে টানা। তাদেরকে অন্য শিশুর মতো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া উচিত।

১০. অপসংস্কৃতি : আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেকেই বিদেশি সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাই নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ও লালনের

মাধ্যমে সুস্থ মনন ঘটনের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ড় কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

১১. সাম্প্রদায়িকতা : প্রতিটি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শান্ড়ি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া এবং পৃথিবী থেকে অন্যায় ও অবিচারের চির অবসান ঘটানো। কিন্ড়ু সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, জুরাথাস্ত্র-এর ধর্ম এবং সর্বশেষ ইসলামধর্ম– প্রতিটি ধর্মই স্রষ্টায় বিশ্বাসী হলেও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মপন্থা পরিবর্তিত হয়েছে। কালের পরিক্রমায় মানুষের জীবনযাপন প্রণালিকে মানুষের বুদ্ধি, শিক্ষা ও জ্ঞান গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান সময়ে বর্ণে বর্ণে, ধর্মে ধর্মে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বিভেদ তার প্রধান কারণ হচ্ছে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। কিন্ড়ু বিশ্বের সকল ধর্ম প্রচারকই তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন বিশ্ব থেকে অশান্ড়ি দূর করে শান্ড়ি স্থাপনের জন্য। তাঁরা শত্র" মিত্র সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সকলকে মঙ্গলের পথে আহ্বান করেছিলেন। কাউকে জোর করে তার ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। বর্তমানে মানুষ তাদের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে হানাহানি কাটাকাটিতে মত্ত রয়েছে, যা কখনো কাম্য হতে পারে না। ধর্মে ধর্মে হানাহানি নয় বরং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে পারলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' কবির এ কথাকে মনে রাখলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও সারা বিশ্বে শান্ড়ির সুবাতাস বইতে থাকবে। এজন্য প্রয়োজন ধর্মের মহৎ গুণকে উপেক্ষা না-করে ধর্মের সত্যিকারের কল্যাণমুখী কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে ধর্মকে উদ্ধার করা। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' সকল ধর্মের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বা জাতিভুক্ত হয়ে বসবাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছে।

বর্তমান শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেবল সুশিক্ষাই আমাদের হাতিয়ার। কেননা অশিক্ষা হচ্ছে অন্ধকার আর সুশিক্ষা হচ্ছে আলোর দিশারী। অশিক্ষা দিতে পারে দুঃখ অপর দিকে সুশিক্ষা দেয় সুখ, আনন্দ ও বিশ্বশান্ড়ি—যা আমাদের একমাত্র কাম্য।

তার"ণ্যের সংকট

জীবনের গুর"ত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে তার"ণ্য। এ সময় বাল্যকাল বা বৃদ্ধকাল থেকে স্বতন্ত্র্য। মানুষ যখন তার"ণ্যে পৌঁছে তখন সে তার বালকত্ব হারায় একইভাবে সে যখন পৌঢ়ত্বে পৌঁছে তখন সে তার তার"ণ্য হারিয়ে ফেলে। তাই তার"ণ্যকাল হচ্ছে একটি হেঁয়ালিপূর্ণ সময়। সাধারণত ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ড় সময়কে তার"ণ্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

এ-বয়সটা এমনই সময় যখন তর"ণ তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। এ কাজ করতে গিয়ে যদি সে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে তাহলে সে সফলতা অর্জন করে অন্যথায় সে বিফল হয়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। তর"ণদের যদি প্রশ্ন করা যায় কারা কারা জীবনে সফলতা অর্জন করতে চায়—তবে সকলেই ইতিবাচক জবাব দেবে। কিন্ড়ু যদি প্রশ্ন করা যায় কারা কারা শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হতে চায় তাহলে একইরূপ ইতিবাচক জবাব হয়তো পাওয়া যাবে না। এর কারণ স্পষ্ট। কেননা শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হওয়া আর জীবনে সফলতা অর্জন করা এক জিনিস নয়। সকল শ্রেষ্ঠ ছাত্রই জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে না। কেননা সফলতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, সফলতার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়, লক্ষ্য স্থির করতে হয় এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। একজন ভালো ছাত্র যাকে বইয়ের পোকা বলা যায় তার এসব গুণাবলি নাও থাকতে পারে। এমনকি সে জীবনের সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে।

জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারলে সুখী হওয়া যায়। কেননা সুখ ও সাফল্য পাশাপাশি চলে। সফলতা বলতে আমরা বুঝি লক্ষ্যে পৌঁছানো আর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে সুখ আপনাআপনিই এসে ধরা দেবে।

সফল হতে গিয়ে বাধাগ্রস্ড় হলে অনেকেই ঘাবড়ে যায়। এটা পরিহার করা উচিত। বরং মনে রাখা উচিত প্রতিটি বাধাই উন্নয়নের সোপান। ইংরেজিতে একটি বাক্য আছে Failure is the pillar of success. এজন্যেই কোথাও বাধাগ্রস্ড় হলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা অত্যাবশ্যক। তাহলেই সকল বাধা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জীবনকে আমরা একটি ক্যাফেটেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে ক্যাফেটেরিয়া থেকে সে সেই পরিমাণ আহার গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে সফলতার জন্য নিজে যে পরিমাণ শ্রম দেবে সেই পরিমাণ সফলতা অবশ্যই সে লাভ করবে। মনে রাখা উচিত জীবন রংধনুর মতো। রংধনু সৃষ্টির জন্য যেমন রোদ ও বৃষ্টি দুটিরই প্রয়োজন তেমনই সুখের জন্য আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও প্রয়োজন। জীবনে আশা-নিরাশা, দুঃখ-আনন্দ,

ভালোবাসা-ঘৃণা ও পশুত্ব-মানবতা সবই রয়েছে। আশা থাকলে নিরাশা যেমন থাকবে ভালো থাকলে মন্দও থাকবে। জীবনের সবকিছুই আমাদের ইচ্ছানুরূপ হয়ে যাবে এটা ভাবা যায় না। ইচ্ছার বির"দ্ধেও অনেক অশুভ জীবনে আসবে তবে সেই অশুভকে কীভাবে আমরা মোকাবিলা করবো সেটাই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি অশুভকে সার্বিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি তাহলে আমাদের সাফল্য কোনভাবেই বাধাগ্রস্ড় হবে না।

বাল্যকালে প্রতিটি শিশু তার পিতামাতা এবং শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। বয়স যতই বাড়ে শিশুর প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় তার"ণ্যে তারা অধিক স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠে বলে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। এমতাবস্থায় তার"ণ্যে মানুষ বিভিন্ন সংকটে পতিত হয়। এ সংকট হতে পারে :

১. শিক্ষাসংক্রান্ড় সংকট : একজন কিশোর যখন নবম, দশম বা একাদশ শ্রেণীতে ওঠে তখনই তার যে সমস্যা দেখা দেয় তা হচ্ছে সে কোন বিভাগ নিয়ে পড়বে। অনেক পিতামাতাই চান তার সন্ড়ান ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্ড়ু সন্ড়ানের হয়তো আইন পড়ার প্রতি ঝোঁক। এটা অনেক অভিভাবকই বুঝতে চান না। পড়ালেখা তথা বিষয় নির্ধারণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক বা বন্ধু-বান্ধব পরামর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন, কোন অবস্থায়ই নির্ধারকের ভূমিকা নয়। তবে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের পর এ-বিষয়ে দৃঢ়চেতা হতে হবে যাতে করে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। আমাদের দেশে বিষয় বা বিভাগ নির্ধারণের বিড়ম্বনায় অনেক শিক্ষার্থীর জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

২. কর্মসংক্রান্ড় সংকট : শিক্ষা সমাপনের পর পেশা নির্ধারণে প্রতিটি ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করতে হবে। একজন তর"ণ বা যুবক নিজেই চিন্ড়া করবে তার প্রতিভা এবং সৃজনীশক্তি কতটুকু। নিজ প্রতিভা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ করলে সফলতা অর্জন সম্ভব। আমার বন্ধু ভালো ব্যবসায়ী বলে আমিও ভালো ব্যবসায়ী হতে পারবো এটা সঠিক নয়। ব্যবসায়ী হতে হলে আমার যে মেধা থাকা প্রয়োজন সেটুকু নিজের মধ্যে আছে কি না তা অন্যের চেয়ে আমিই ভালো বুঝতে পারবো।

৩. ব্যক্তিত্বের সংকট : ব্যক্তিত্ব বলতে আচার-আচরণ, চিন্ড়াচেতনা, মানসিকতা, নৈতিকতা, আদর্শ, স্বপ্ন, দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণাবলির সমন্বয়কে বোঝায়। তাই তার"ণ্যে মানুষকে এমন আচার-আচরণ শিখতে হয় যা পরবর্তী জীবনে সফলতা বয়ে আনতে ভূমিকা রাখে। এ বয়সে বন্ধু নির্বাচনও একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো বন্ধু নির্বাচন করলে জীবনের সফলতায় তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে কিন্ড়ু বন্ধু নির্বাচন যদি সঠিক না হয় বা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বন্ধু যদি নির্বাচন করা না যায় তাহলে প্রতি পদক্ষেপেই একজন তর"ণকে হোঁচট খেতে হবে।

মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপকর্মে তর"ণরা প্রধানত বন্ধু-বান্ধবের কারণেই আকৃষ্ট হয়। একজন তর"ণকে এ বয়সে একইসঙ্গে আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা আর্কিটেক্ট একটি ভবনের ব- ু প্রিন্ট করেন কিন্ড়ু ইঞ্জিনিয়ার সেই প্রিন্ট অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করেন। তাই তর"ণ বয়সে যেমন লক্ষ্য স্থির করতে হবে একইসঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছার মতো কাজ সম্পন্ন করে ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে।

৪. বৈবাহিক সংকট : যৌবনে প্রতিটি মেয়েকেই সুন্দর আর প্রতিটি ছেলেকেই সুদর্শন বলে মনে হয়। তর"ণ বয়সে প্রতিটি ছেলেই সুন্দরী মেয়েকে আর প্রতিটি মেয়েই সুদর্শন ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। এ বয়সের এমনই বৈশিষ্ট্য যে প্রতিটি ছেলের কাছে প্রতিটি মেয়েকেই ভালো লাগে আর প্রতিটি মেয়ের কাছেই প্রতিটি ছেলেকে ভালো লাগে। কিন্ড়ু এ ভালো লাগা সাময়িক। মন মানসিকতা ও হৃদয়ের মিলই হচ্ছে চিরস্থায়ী। তাই বিয়ে করার পূর্বে নিজের দুর্বলতাটুকু যাচাই করতে হবে এবং যাকে জীবনসঙ্গী করা হচ্ছে তার কাছ থেকে কী পরিমাণ সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে তার হিসাব করতে হবে। এক্ষেত্রে পিতামাতাই সবচেয়ে ভালো পরামর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তর"ণ ব্যক্তিকে বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই পরিণত ব্যক্তির মতো আচরণ করতে হবে– সুষ্ঠু চিন্ড়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ড় নিতে হবে যাতে করে পরবর্তী জীবনে এর জন্য অনুশোচনা করতে না হয়।

৫. প্রলোভন সংকট : বর্তমান সময়ে মানুষ সাময়িক আনন্দ নিয়েই সন্ড়ুষ্ট থাকতে পছন্দ করে। সাময়িক আনন্দের জন্য তারা কত কিছুই না করে। স্মার্ট হওয়ার জন্য সিগারেট খাওয়া শুর" করে। এই সিগারেট থেকে শেষপর্যন্ড় মদ, ভাঙ্গ, ড্রাগে আসক্ত এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গে যুক্ত হয়ে এইডস নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ড় হয়। যদিও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো আমাদের অবস্থা এখনো তেমন নাজুক নয় তবু এ নিয়ে আমাদের চিন্ড়ামুক্ত হলে চলবে না। বরং এখন থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

তার"্য এমন এক সময় যখন সফলতার জন্য সঠিক পথটি ধরতে না পারলে গন্ড়ব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। তবে সাফল্যে পৌঁছার জন্য কতকগুলো জিনিসের প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে—সৎচরিত্র, আত্মবিশ্বাস, মনোবল, দৃঢ়প্রত্যয় এবং সৎসাহস। কোন ব্যক্তির যদি এ গুণগুলো থাকে তাহলেই সে সমাজকে এমন কিছু দিতে পারবে যার মাধ্যমে সমাজ আলোকিত হবে এবং বসবাসের জন্য এ বিশ্ব বর্তমানের চেয়েও আরও সর্বমঙ্গলা হবে।

আমাদের অধিকাংশ তর"ণ বর্তমানে মা, মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে ভুলে যাচ্ছে। নিজ মঙ্গলই প্রতিটি ব্যক্তির নিকট প্রধান কাম্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এ উপমহাদেশের একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব রাজা দেশপান্ডে বলেছেন, GOD এবং GOLD এর মধ্যে মাত্র একটি বর্ণ L এর ব্যবধান রয়েছে। এই L বর্ণকে যদি আমরা মানুষ এবং মাতৃভূমির জন্য Love অর্থাৎ ভালোবাসায় রূপান্তর করতে পারি তাহলে সেই ভালোবাসা আমাদেরকে GOD এর সন্নিকটবর্তী করে দেবে, ফলে আমরা সুখী হতে পারবো। আর এই সুখই আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কামনার ধন।

সুখের সন্ধানে

সুখের জন্য মানুষের প্রাণান্ড় চেষ্টার শেষ নেই। পৃথিবীর সকল মানুষই সুখ চায়। কিন্ড়ু সুখ কী? সুখী হতে কী প্রয়োজন? কেউ হয়তো বলবে সুখী হওয়ার জন্য সুস্থতা ও সম্পদ প্রয়োজন; কেউ বলবে সুখী হওয়ার জন্য মানসিক শান্ড়ি প্রয়োজন। এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। এ-বিষয়ে বিভিন্ন জনের বক্তব্যে ভিন্নতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। আসলে এটা নির্ভর করবে সুখের সংজ্ঞা কে, কীভাবে নিচ্ছেন, তার ওপর। হেলেন কিলার বলেছেন : Happiness cannot come from without. It must come from within. It is not what we see and touch or that which others do for us which makes us happy; it is that which we think and feel and do, first for the other fellow then for ourselves. (সুখ বাইরের বিষয় নয়। এটা অন্ড়র থেকে উৎসারিত হয়। সুখ ধরা-ছোঁয়ার বিষয় নয়, আবার অন্যের সেই কাজও নয়—যা আমাদেরকে সাময়িক আনন্দ দেয়। সুখ হচ্ছে পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া; যা সত্যিকার অর্থে নিজেকে সুখী করার সামিল।) অন্য একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, সুখী হওয়ার জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। 'আমি' আর 'তুমি'। এ-বিশ্বে 'আমি' আমার সুখ চাই। আর 'তুমি' তোমার সুখ চাও। কিন্ড়ু সে সুখ কীভাবে পাওয়া যাবে? সে কাঙ্ক্ষিত সুখ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে, সেই 'আমি' আর 'তুমি'। অর্থাৎ 'আমি যদি শুধু নিজের কথা না-ভেবে তোমার সুখের কথাও ভাবি আর তুমিও যদি একইভাবে শুধু তোমার সুখের কথা না-ভেবে আমার সুখের কথা ভাবো–একমাত্র তখনই সেই কাঙ্ক্ষিত সুখ পাওয়া সম্ভব। সুখের উৎস খুঁজতে গিয়ে কবি কামিনী রায়ের ভাষায় বলতে হয়—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

সুখী হওয়ার এটাই হচ্ছে গোপন রহস্য। এই গোপন রহস্যকে বাস্ড়বে রূপ দিতে হলে আমাদের কী করতে হবে? প্রথম কথা হচ্ছে আমি কী চাই, অর্থাৎ আমার স্বপ্ন কী, অন্যকে তা বুঝতে দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাকে এটাও বোঝাতে হবে যে, আমি তার মাধ্যমেই আমার স্বপ্নের বাস্ড়বায়ন করতে চাই। আমি যদি অন্যকে এটা বুঝতে সক্ষম হই যে, সে ছাড়া আমার স্বপ্নের বাস্ড়বায়ন সম্ভব নয় তাহলে তার মাধ্যমে আমার স্বপ্নের বাস্ড়বায়ন খুবই সহজ। তবে অন্যের হৃদয়ে আমার স্বপ্নের বীজ বুনতে হলে আমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সে কৌশলটি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।

মানুষ একা সুখ উপভোগ করতে পারে না। সে তার সুখ অন্যকে সঙ্গে নিয়ে উপভোগ করতে চায়। অন্যকে সঙ্গে নিয়ে উপভোগ না-করতে পারলে সুখের কোন মূল্য নেই। তাই আমরা আমাদের জন্মদিনে কিংবা যে কোন ধরনের বিশেষ অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করে থাকি। এই আয়োজনের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে আনন্দ Share করে নেই। মানুষ যদি অন্যের সঙ্গে তার আনন্দকে Share করতে পারে তাহলে সে আনন্দ আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। একইভাগে যেকোন দুঃখ অন্যের সঙ্গে Share করলে সে দুঃখও অনেকগুণ কমে যায়। সুখের সময় যারা আমাদের আনন্দের অংশীদার হয় আর দুঃখে সমব্যথী হয় তারাই তো আমাদের সত্যিকারের বন্ধু। আর বন্ধুত্ব ছাড়া সমাজ অর্থহীন, প্রাণহীন এবং অচল। তাই সমাজের শান্ড়ি তথা ব্যক্তিগত শান্ড়ির জন্য যে কথাগুলো জর"রি সেটি হচ্ছে 'আমি' আর 'তুমি'।

মানুষমাত্রই অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়। একে অন্যকে সহযোগিতা দিতে চায়। একই সঙ্গে অন্যের সহযোগিতা কামনা করে। 'আমি' যেমন তোমার সহযোগিতা চাই তেমনই 'তুমি'ও আমার সহযোগিতা চাও। অর্থাৎ আমরা পরস্পরের বন্ধুত্ব চাই। তাই আমাদের সুখের জন্য 'আমি' আর 'তুমি' এর মধ্যে যদি কোন ধরনের স্বার্থপরতা থাকে তা পরিত্যাগ করতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা সমাজ প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিককালে আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি এর মূলেও কাজ করে পরমতসহিষ্ণুতা। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তির হাত ও জিহ্বা থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয় সে প্রকৃত মুমিন নয়।' এখানে মহানবী (সা.) শুধু অন্য মুসলিমের নিরাপদ থাকার কথাই বলেন নি, তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের নিরাপদ থাকার কথা বলেছেন।

সবাই সুখী হতে চায়। তবে সুখী হতে হলে প্রতিটি মানুষকে সৎ, বিশ্বাসী, বন্ধুত্বপরায়ণ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া জর"রি। 'আমার' এবং 'তোমার' স্বার্থহীন কর্মকা"ের মাধ্যমে তথা আমাদের ত্যাগের মাধ্যমে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে ওঠা সম্ভব। মানুষের মধ্যে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব একই সঙ্গে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব আছে তা বর্জন করে মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে তার চর্চা করতে হবে আর এই চর্চার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে দেবত্ব জাগ্রত হবে। 'Help ever-Hurt never.' এ আপ্ত বাক্যটিকে সুখী হবার মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বে শান্ড়ি স্থাপনে 'আমি' আর 'তুমি' একত্রিত হলেই মানুষের মধ্যে দেবত্বের জন্ম নেবে এবং আমরা সকলে সুখী হতে পারবো।

মানবিক গুণাবলি ও নেতৃত্ব

শিশুকাল থেকেই আমরা জ্ঞানার্জন শুরু করি। এদেশের প্রতিটি মা-বাবাই তার শিশুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আগ্রহী। সেজন্য শিশুকাল থেকেই তারা তাদের শিশুকে তেমন শিক্ষাদান শুরু করেন। প্রেম, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সত্যবাদিতা, শান্ড়িপ্রিয়তা, অহিংসতা আর সু আচরণ যে মানবিক গুণাবলির বৈশিষ্ট্য এটা প্রতি মা-বাবাই তার সন্ড়ানকে শিক্ষা দেন। কিন্ড়ু আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে যাদেরকেই আমরা দেশের কর্ণধার হিসেবে পেয়েছি তাদের অধিকাংশের মধ্যেই এ গুণাবলি নেই। তারা নেতৃত্বকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন—যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কিন্ড়ু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! এজন্যে দায়ী বর্তমান বিশ্বসংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি অর্থকেই উপাস্য হিসেবে পূজা করে। অহমিকাকেই ধর্ম হিসেবে প্রাধান্য দেয়। এ সংস্কৃতিতে সততার কোন মূল্য নেই বরং কপটতাই জীবনের দ্যুতি। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে ভূমিকা না রেখে লোভ লালসা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। তাই আমাদের সমাজের এমন দুরবস্থা। এমন লজ্জাজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার সমন্বয় ঘটানো। একমাত্র এর চর্চার মাধ্যমেই আমরা আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হব।

আজকে যারা শিশু বা যুবক আগামী দিনে তারাই হবে এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা ব্যবসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষকতা প্রভৃতি পেশায় যোগ দিয়ে বা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হয়ে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আমরা তাদের মধ্যে এসব অরাজকতা কিংবা অসততা দেখতে চাই না। আমরা চাই তারা দেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমাদের দেশের মানুষ শান্ড়িকামী। তাই তো বিশ্বে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তখন এদেশের মানুষ নীরবে তার নিন্দা জানায়। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অন্যকে আক্রমণ করে না। এর কারণ হচ্ছে এদেশের মানুষ সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক। এটা আমাদের জীবনের অংশ। এদেশের মানুষ কর্মে ভালোবাসাকে ধর্ম, চিন্ড়ায় ভালোবাসাকে শান্ড়ি আর সমঝোতায় ভালোবাসাকে অহিংসতা বলে বিশ্বাস করে।

সমুদ্র ও নদীর পানিকে সূর্য বাষ্পে পরিণত করে মেঘ হিসেবে আকাশে জমা করে এবং পরে বৃষ্টি হিসেবে পৃথিবী দান করে। এ বৃষ্টির পানি পুনরায় নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রে গমন করে। ঠিক একইভাবে নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তার

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, ধারণ করেন এবং সমাজ উন্নয়নে তার বাস্ড়ব প্রয়োগ করেন।

আব্রাহাম লিংকন তাঁর পুত্রকে স্কুলে পাঠানোর সময় শিক্ষকের উদ্দেশে যে পত্রটি লিখেছিলেন তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির সৃষ্টির প্রভূত উপাদান রয়েছে। তাই এ পত্রটি এখানে সংযোগ করা গেলো।

আমি জানি, ওকে জানতে হবে যে সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব নারী-পুর"ষই সৎ নয়, তাকে শিখিয়ে দিও যে সংসারে দুর্বৃত্ত যেমন আছে তেমনই বীরোচিত গুণাবলির মানুষও আছে, স্বার্থপর রাজনীতিবিদ যেমন আছে তেমনই উৎসর্গীকৃত নেতাও আছে। শত্র" যেমন আছে, তেমনই মিত্রও আছে। যদি পার তাকে পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দিও এবং শিক্ষা দিও নির্মল হাসির গোপন রহস্য।

প্রথমদিকেই তাকে শিখিয়ে দিও যে উৎপীড়নকারীরা সহজেই পদানত হয়। বইয়ের পাতায় যে অত্যাশ্চর্য ভা"ার আছে তা ওকে চিনিয়ে দিও, ওকে কিছু নির্জনতা দিও, যাতে করে সে আকাশের পাখির ওড়া, সূর্যের আলোয় মৌমাছিদের ঘোরাফেরা কিংবা সবুজ পাহাড়ে ফুলের সমারোহ দেখে ভাবতে পারে।

ওকে শিখিয়ো, অসৎ উপায় অবলম্বন করার থেকে অসফল হওয়া অনেক সম্মানজনক। ওকে শিক্ষা দিও, যদি অন্য সকলে বলে যে ওর ধারণাগুলি ভুল তবু যেন ও নিজের বিশ্বাসে অটল থাকে। তাকে আরও শিক্ষা দিও ভদ্র লোকের সঙ্গে ভদ্র হতে এবং ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমার ছেলেকে শক্তি দিও, অন্য সকলে যখন ঠেলাঠেলি করে কোনও প্রত্যাশায় গাড়িতে ওঠে, তখন ও যেন জনতাকে অনুসরণ না করে। শিক্ষা দিও যেন সকলের কথা শোনে, কিন্ড়ু যা শোনে তা যেন সত্যের ছাঁকুনিতে ছেঁকে নিয়ে যে সারটুকু থাকে তাই গ্রহণ করে। হে পথিবী! যদি তুমি পারো তাহলে তাকে শিক্ষা দিও দুঃখের সময়েও কীভাবে হাসতে হয়... আরও শিক্ষা দিও অশ্র" বিসর্জনে কোন লজ্জা নেই। তাকে শিক্ষা দিও হতাশাবাদীকে উপহাস করতে, তাকে শিক্ষা দিও চাটুকারদের থেকে সতর্ক থাকতে।

শিক্ষা দিও, যেন কখনও নিজের হৃদয় ও আত্মাকে বিক্রয়যোগ্য না করে। শিক্ষা দিও যেন উচ্ছৃঙ্খল জনতার চিৎকারে কান না দিয়ে নিজে যা সঠিক মনে করে তার জন্য লড়াই করতে পারে।

সহৃদয়ভাবে শিক্ষা দিও পৃথিবী! কিন্ড়ু অধিক প্রশ্রয় দিও না, কারণ লোহা আগুনের উত্তাপের মধ্য দিয়ে গেলেই তা থেকে উত্তম ইস্পাত তৈরি হয়। অসহিষ্ণু না হতে তাকে উৎসাহ দিয়ো, সহিষ্ণু হতে তাকে সাহস যুগিয়ো। তাকে শিক্ষা

দিও নিজের প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বাস রাখতে কেননা তাহলেই সে মানুষের প্রতি পরম বিশ্বাস রাখতে শিক্ষা লাভ করবে।
এটি খুবই দীর্ঘ প্রত্যাশা, কিন্ডু দেখো কতটা করা যায়। ও এত ভালো ছেলে।

Abraham Lincoln's Letter to His Son's Teacher (To the world)

He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero; that for every selfish Politician, there is a dedicated leader... Teach him for every enemy there is a friend, Steer him away from envy, if you can, teach him the secret of quiet laughter.
Let him learn early that the bullies are the easiest to lick... Teach him, if you can, the wonder of books.. But also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on a green hillside.
In the school teach him it is far honourable to fail than to cheat... Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong... Teach him to be gentle with gentle people, and tough with the tough.
Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the band wagon... Teach him to listen to all men... But teach him also to filter all he hears on a screen of truth, and take only the good that comes through.
Teach him if you can, how to laugh when he is sad... Teach him there is no shame in tears, Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness... Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders but never to put a price-tag on his heart and soul.
Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he's right. Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel.
Let him have the courage to be impatient... Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have sublime faith in mankind.
This is a big order, but see what you can do... He is such a fine fellow, my son!
আমাদের মনে রাখতে হবে, জীবন হচ্ছে একটা প্রতিযোগিতা—একে মোকাবিলা করতে হবে। জীবন হচ্ছে ভালোবাসা—একে অন্যের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভোগ করতে হবে, জীবন হচ্ছে স্বপ্ন—একে বাস্ড়বে রূপ দিতে হবে, আবার জীবন হচ্ছে একটা খেলা—এ খেলায় জিততে হবে। তাই যুব বয়সেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করার মানসে।

বর্তমান সময়ে যুব ও বয়স্কদের মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। বড়রা যেমন ছোটদেরকে স্নেহ করেন না তেমনই ছোটরাও বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু ছোটরা যদি বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না-করে তাহলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য এমন সময় আসবে যখন তাদের ছোটরা তাদেরকে সম্মান করবে না। এটা আমাদের দেশাচার নয়। এই অশুভ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সময়ে আমরা বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছি যা মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। আমরা স্রষ্টার নিয়মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছি। ফলে আমাদেরকে এর প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে। আমরা সোনামি ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি। এসব বিষয়ে আজকের যুবশক্তিকে সোচ্চার হতে হবে—কেননা তারাই আগামী দিনের দেশের কর্ণধার এবং তাদের মধ্যে যে অফুরন্ড় শক্তি আছে সে শক্তি কাজে লাগালে আমাদের দেশ সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

একজন গরিব শিশুর গল্প দিয়ে আমার নিবন্ধটি শেষ করতে চাই। এক গরিব শিশুর বাসনা ছিল সে একটি নৌকার মালিক হবে। তার অক্লান্ড় চেষ্টায় একদিন সত্যি সত্যি সে একটি নৌকার মালিক হলো। তার আনন্দ আর ধরে না। সে তার মাকে নৌকাটি দেখানোর জন্য নিয়ে গেল এবং মাকে বললো: মা আজ আমি এ নৌকার মালিক ও চালক। আমার আজ খুবই আনন্দ। মা ছেলের আনন্দে খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন: বাবা তুমি তো আজ এ নৌকার চালক, কিন্তু তুমি কি চালকদের চালক হতে পার না? মায়ের কথায় সে অনুপ্রাণিত হলো এবং রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার জন্য তার প্রচেষ্টা শুর" করলো এবং একদিন একটি দেশের সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো এবং পরে সে তার দেশের রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হলো।

তাই যুবকদের মধ্যে যে অফুরন্ড় সুপ্ত শক্তি রয়েছে সে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা মানবিক গুণসম্পন্ন নেতৃত্ব অর্জন করে দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে অমরত্ব লাভ করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পথশিশুদের প্রতি দায়িত্ব

আমরা পথশিশু বলতে প্রধানত এতিম শিশুদের বুঝে থাকি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে শুধু এতিমরাই পথশিশু নয়। আমরা যখন পথ চলি তখন প্রায়শই দেখি যে বাস বা ট্রেন লাইনের পাশে উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে শিশুরা জটলা করছে। এরাই পথশিশু। এছাড়াও পথশিশুদের সাইকেল মেকানিকের দোকানে কিংবা ট্রাফিক জ্যামে ফুল কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি অথবা লম্বা একটা ঝাড়ু দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করতে দেখা যায়। কখনো কখনো এরা ভিক্ষা করে আবার কখনো-বা কাজ করে যে সামান্য অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে তাদের জীবিকানির্বাহ করে। এ ছেলেমেয়েরা ক্ষেত্রবিশেষে চুরি কিংবা পকেটমারের কাজেও অভ্যস্ড় হয়ে পড়ে। অনেককে স্থানীয় মাস্ড়ানরা তাদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত করে মাদকব্যবসায় যুক্ত করে আর মেয়েদেরকে যৌনকর্মের মতো অসুন্দর কাজের জন্য বিক্রি করে দেয়। যারা এসব জঘন্য কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে তারা এমন সব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় কাজ বেছে নেয় যে, অবশেষে তারা মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমনকি অনেক পথশিশু অকালে মৃত্যুবরণ করে—যার হিসেব কেউ রাখে না। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে এর কারণ কী? অনুসন্ধানে দেখা গেছে—এদের কিছু অংশ এতিম হলেও অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে পথশিশুতে পরিণত হয়েছে। এ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে— পিতামাতার দারিদ্র্য, সৎমা বা সৎ বাবার জ্বালাতন ও নির্যাতন, কিংবা অশিক্ষিত পিতামাতার নির্দয় ব্যবহার। এদের অবস্থা সত্যিকার অর্থেই হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসার পাবার যোগ্য। কেননা এরা থাকার জন্য কোন আশ্রয় পায় না, চিকিৎসার কোন সুযোগ পায় না। এরা সাধারণত ট্রেন বা বাসস্টেশনে ও লঞ্চ টার্মিনালে রাত যাপন করে এবং পুলিশসহ সাধারণ মানুষ দ্বারা নির্যাতিত হয়।

এসব পথশিশু চুরি, পকেটমার কিংবা ভিক্ষা করে তাদের দৈনিক খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা ঠিকই কোন-না কোনভাবে মিটিয়ে নেয় কিন্তু তারা যা পায় না তা হচ্ছে স্নেহ ও মমতা। এ পথ শিশুদেরকে স্বাভাবিক শিশুদের মতো জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তাদের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা। ভালোবাসা দিয়েই এসব বখে যাওয়া পথশিশুদের সমাজে ফিরিয়ে এনে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু এসব পথশিশু শুধু মুখের কথাতেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে না। কেননা জন্ম থেকে তারা যেভাবে নির্যাতিত হয় এতে মানুষের প্রতি তাদের সন্দেহ থেকেই যায়। তাই এসব পথশিশুকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসতে হবে—তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তাদের যত্ন নেওয়ার মতো সত্যিকার মানসিকতাই আমরা পোষণ করি। তাহলেই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত হতে পারে। আরও মনে

রাখতে হবে—পথের জীবন মুক্ত জীবন। যখন যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যায়। যখন যা ইচ্ছে তা করা যায়। তাই এসব মুক্ত জীবনযাপনকারী পথশিশুদেরকে সুশৃঙ্খল জীবনে ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। তবে এসব পথশিশুকে পর্যায়ক্রমে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ড় করা অসম্ভব নয়। প্রথমে এসব আশ্রয়হীন পথশিশুদের রেল বা বাসস্টেশনের পাশে পরিত্যক্ত কক্ষে অন্ড়ত একটু স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর তাদেরকে প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে হবে। তাদেরকে কিছুটা নিয়মের মধ্যে আনতে হবে। তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে, আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে আপন করতে হবে। সর্বশেষে তাদেরকে কারিগরি ও মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলেই এসব পথশিশু সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে।

পথশিশুদেরকে আমাদের ঘৃণা করলে চলবে না। কেননা ওরা আমাদের সমাজেরই সৃষ্টি—তাদের পরিণতি ভাগ্যের লিখন নয়। গ্রাফাইটকে কাটতে কাটতে যেমন হীরার টুকরায় পরিণত হয়, তেমনই এসব পথশিশুকে যত্ন করলে একদিন তারা সভ্য হয়ে উঠবে, মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবে। উন্নত দেশসমূহে অনেক পথশিশু আছে যারা এখন গৌরবময় জীবনযাপন করছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা ক্রিকেটার কটনী ওয়েলস ও জার্মান চেন্সেলর হিটলার ছিলেন পথশিশু। পিথাগোরাস ছিলেন কামারের ছেলে, সবুক্তগিন ছিলেন ক্রীতদাস, জেমস ওয়ার্ট ছিলেন মিস্ত্রির ছেলে, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম ছিলেন একজন মাঝির সন্ড়ান। তাঁরা সবাই সুযোগের সদ্ব্যবহার ও মেধার চর্চা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অতি সম্প্রতি পথশিশু নোলক বাবু সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিথযশা ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

সমাজের উন্নয়নের জন্যেই পথশিশুদের প্রতি আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন। সাধ্যাতীত না হলে আমাদের সকলেরই উচিত পথশিশুদের জন্য কিছু একটা করা। আর যদি কিছুই করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্ড়ত তাকে ঘৃণা না করে, কর্ণা না করে একটি মিষ্টি হাসি দিয়ে সম্মান জানানো। তার প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। নিজ খাবার থেকে অল্প খাবার তাকে পরিবেশনের মাধ্যমে। যুবকরা নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি থেকে কিংবা ছোট ভাইবোনদের পুরোনো কাপড়গুলো সংগ্রহ করে শীত বা বৃষ্টিতে তাদেরকে পরতে দিতে পারে। যেসব সংগঠন পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে তাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করা যেতে পারে। পথশিশুরা আমাদের সমাজেরই অংশ। এদের উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে সমাজের প্রগতি। এ প্রগতিকে সফল করতে যুবসমাজই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম। পরিশেষে একটি গল্প দিয়েই আমার নিবন্ধটি শেষ করতে চাই। গল্পটি এক গরিব আদিবাসী লোকের।

তিনি একদিন সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পান যে জোয়ারের সময় ওঠে আসা প্রচুর স্টার ফিস সেখানে পড়ে আছে। পানি নেমে যাওয়ার ফলে এ স্টারফিসগুলোর অধিকাংশই মরে গেছে এবং যেগুলো জীবিত আছে সেগুলোও মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আদিবাসী ছিলেন একজন প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ। স্টার ফিসগুলোর জন্য স্বভাবতই তার দরদ হলো। তিনি সৈকত থেকে একটা একটা করে জীবিত স্টার ফিস সংগ্রহ করে সমুদ্রের পানিতে ফেলতে লাগলেন। একজন পর্যটক কৌতূহলবশত তাকে প্রশ্ন করলেন: ভাই, আপনি কী করছেন? আদিবাসী জবাব দিলেন: পানির অভাবে এ স্টার ফিসগুলো মারা যাচ্ছে, তাই আমি এদের কুড়িয়ে সমুদ্রের পানিতে ফেলছি। পর্যটক উপহাস করে বললেন: ভাই, এখানে লাখো লাখো স্টার ফিস পড়ে আছে, আপনি কয়টি স্টার ফিসকে বাঁচাতে পারবেন? আদিবাসী লোকটি মুচকি হাসি দিয়ে আরও একটি স্টার ফিসকে ওঠালেন এবং সমুদ্রের পানিতে ফেলতে ফেলতে বললেন, আমার অন্ড়ত এইটুকুই সান্ড়না যে, আমি অন্ড়ত এই একটি স্টার ফিসের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। এই আদিবাসী ব্যক্তির মতো আমরা যদি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানবকল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি তাহলেই সমাজের কিছুটা হলেও পরিবর্তন ঘটবে।

আমরা কি পারি না আমাদের কর্মের মাধ্যমে, আমাদের ভালোবাসার মাধ্যমে এ পথশিশুদের জীবনে সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে?

ধর্মীয় সহনশীলতা

অন্ধবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতা জঘন্য অপরাধ। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম। সেজন্যই যা কিছু মানুষের জন্য ভালো তা-ই ধর্মের অন্তর্গত। ইসলাম অনন্ত মানব প্রেমের ধর্ম। এজন্য প্রকৃত মুসলমান অন্য ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতিকে কখনো খাটো করে দেখেন না। ইসলামের সুফিবাদে বিশ্বাসী মহান ব্যক্তিরা মানবপ্রেমের জয়গান গেয়েছেন। অসহায় দুর্বল মানুষের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। শুধু ইসলামধর্মেই নয় সকল ধর্মেই এ কাজ উত্তম বলে বিবেচিত হয়ে আসছে যুগ যুগ থেকে।

মানুষের আদি পিতা আদম (আ.) এর জন্ম থেকে মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত মানব জাতি 'ওহি'র মাধ্যমে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ লাভ করে এসেছে। সব ধর্মগ্রন্থ তথা প্রত্যাদেশের উৎপত্তি একই উৎস থেকে, তাই তারা একে অপরের বিরোধী হতে পারে না। তবে স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা অন্যায়ভাবে সংযোজন ও বিকৃতি ঘটানোর ফলেই এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানরা শুধু পবিত্র কোরানের 'ওহি' সমূহেই বিশ্বাস করেন না বরং পূর্ববর্তী 'ওহি' বা প্রত্যাদেশের ওপরও বিশ্বাস রাখতে তারা বাধ্য। বিশ্বাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে: 'এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি, আর আখেরাতকে তারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।' পবিত্র কোরান ও পূববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্তমানে যে অমিল দেখা যায় এর কারণ হচ্ছে—মানুষ তার নিজস্ব ধারণাকে এর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। তবে শুর ে থেকে ইসলাম পূর্ব সময় পর্যন্ত যেসব ধর্মগ্রন্থ নাজিল হয়েছিলো সেগুলো সেই সময়ের মানুষের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছিলো। পবিত্র কোরান যখন নাজিল হয় তখন মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছিলো। তাই পবিত্র কোরান অপরিণত মানুষ ও তার প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা না করে পূর্ণতা প্রাপ্ত মানুষ ও তার প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছে। সেই হিসেবে ইসলাম হচ্ছে আধুনিকতম ধর্ম। ইসলামের সর্বজনীন স্বীকৃতির জন্য মানুষের জ্ঞানের একটা বিশেষ মানে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। মানব জাতি এখন সেই ন্তরেই অবস্থান করছে। কেননা বিবর্তনের ধারায় মানব জাতির বিবর্তন বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

তবে ধর্ম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচ্যের মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম মানব জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে ধর্ম হচ্ছে সামগ্রিক জীবন দর্শন। অপরদিকে পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী ধর্মতত্ত্ব বলতে কতিপয় উপদেশ বাক্য বা আচার-অনুষ্ঠান বোঝায়। ইসলাম এ ধরনের কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম এমন এক বিজ্ঞান যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও

সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ধর্মের জ্ঞান মানব জাতির জন্য অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্ড়ু তথাকথিত মুসলিম জাতিসমূহের স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মোল- াদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে ইসলামের সার্বজনীনতাকে লোকচক্ষুর অন্ড়রালে সফলভাবে ঠেলে দিয়েছেন।

ধর্মীয় পরিচয়ে কোন গোষ্ঠীকে কখনো জাতি বলা যায় না। তাই ইসলামের নাম নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্ড়ান এক জাতি হিসেবে সৃষ্টি হলেও ২৫ বছরও টিকে থাকে নি। কিন্ড়ু বর্তমান সময়ে ধর্ম মানুষের মাঝে একটি উলে- খযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন প্রতিটি ধর্মীয় মতবাদ আন্ড়র্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশেও নানা মতবাদের মানুষ বসবাসরত। সকল ধর্মের সকল গোত্রের মানুষ মিলে আমরা একই রাজনৈতিক পরিচয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছি। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক বেশি হওয়া সত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন করতে পারছেন। এটা ইসলামেরই শিক্ষা। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদে' জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে তৎকালীন মদিনায় বসবাসরত খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমান নাগরিককে এক উম্মাহ বা জাতি বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পবিত্র কোরানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেবতাগণকে গালিগালাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে: 'তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাস্য প্রতিমাদের গালিগালাজ করবে না, কেননা তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত তোমার উপাস্য আল- াহকে গালিগালাজ করবে' (৬ : ১০৮)। এরই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় হজরত ওমর ফার"ক (রা.)-এর জীবনে। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস অধিকার করার পর সেখানকার লোকদের সঙ্গে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন: 'এ চুক্তি তাদের জানমাল, গির্জা, ক্রস, সুস্থ-অসুস্থ এবং সকল ধর্মের অনুসারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের গির্জায় কেউ বসবাস করতে পারবে না। তার আকার-আয়তনের কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। গির্জার ক্রস কেউ ভাঙতে পারবে না। তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না'।

বর্তমানে জঙ্গিবাদি বলে মুসলমানদের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী কিছু বিভ্রান্ড় ব্যক্তির কৃত অপকর্মের জন্য ইসলামকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়ানোর অপপ্রয়াস প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্ড়ু ইসলামে বিশ্বাসী আলেম-ওলামাগণ এটি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ইসলামে সন্ত্রাস বা জোর জবরদস্ড়ির কোন সুযোগ নেই। ইসলাম শান্ড়ির ধর্ম। ঐক্য, সংহতি ও শান্ড়ির বাণী ইসলাম যুগে যুগে প্রচার করছে। সাম্যের চিরন্ড়ন বাণী

হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। মানব সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বজনীন কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতিগত পার্থক্যের কোন স্থান ইসলামে নেই। আকাশ ছোঁয়া উদারতা নিয়ে ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণ করতে মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেছে। তাই সংকীর্ণতা ও অন্ধকার ইসলামি জীবনধারাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ক্ষত ইসলামের গায়ে আঁচড় কাটতে পারে না।

ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শান্তি। ইংরেজিতে ইসলাম লিখতে যেসব বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বিশে- ষণ করে নিম্নরূপ লেখা যেতে পারে।

I = I (আমি)

S = Shall (অবশ্যই)

L = Love (ভালোবাসা)

A = All (সকল)

M = Mankind (মানব জাতি)

অর্থাৎ ইসলাম শব্দকে I shal love all mankind এ অর্থেও ব্যবহার করা যায়। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মূল বাণী।

অধিকাংশ মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশে আমরা যদি ইসলামের মূল বাণী অনুযায়ী চালিত হই তাহলে দেশে অবশ্যই শান্তি বিরাজ করবে।

তথ্যপ্রযুক্তি

সর্বক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নের জন্য তথ্যের ভূমিকা অপরিসীম। সঠিক তথ্যপ্রবাহ মানুষকে গণতন্ত্রের বিকাশে অবদান রাখতে সহায়তা করে। কিন্ডু বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহ তথ্যের সুষ্ঠু প্রবাহের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারে নি। তথাপি বিগত এক দশকে আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে কম্পিউটার, ডিজিটাল গণমাধ্যম এবং টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতির যে উন্নয়ন হয়েছে তার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে আমরাও তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছি।

তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পেতে যে যন্ত্রটি আমাদেরকে সাহায্য করছে তা হচ্ছে কম্পিউটার। এ কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। কিন্ডু কম্পিউটার আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্ব কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেওয়া যায় না। বছরের পর বছর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আমরা আজ কম্পিউটারের এ কার্যকরী রূপটি দেখতে পাচ্ছি। তবে কম্পিউটার আবিষ্কারের কৃতিত্বের জন্য যার নাম প্রথমে আসে তিনি হচ্ছেন চার্লস বেবেজ। এ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি আজ সমগ্র মানব সমাজের চিন্ড়া-চেতনা, কার্যপ্রণালি ও গতিপথ পালটে দিচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বে সকল ব্যবসায়িক কাজে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, মেডিক্যাল সায়েন্সের বিভিন্ন স্ড়রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, এমনকি সামরিক বাহিনীর গোপনীয় কাজেও কম্পিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তথ্যপ্রযুক্তির জগতে বর্তমানে Sub Marine Cable Network ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির এই নেটওয়ার্কের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। যার নাম ট্রান্স অটোমেটিক। এটি ছিল ধাতব কো-এক্সিয়াল ক্যাবল। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এসব নেটওয়ার্কে প্রথমবারের মতো ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে মাত্র দু'জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টেলিফোনের সার্কিট চালু করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সুফল পাওয়ায় সারা বিশ্বে ক্যাবল সংযোগের ক্ষেত্রে বিপ- ব ঘটে। বর্তমানে টেলিযোগাযোগসহ তথ্যপ্রযুক্তির প্রায় ৯০ ভাগ তথ্য বিনিময়ই হচ্ছে ক্যাবলের মাধ্যমে। আইসিটি খাতের বিস্ড়তি এবং সম্ড়ায় সফটওয়্যার রপ্তানী বা ডাটা ট্রান্সমিশনের সুবিধাও পাওয়া যায় এই ক্যাবলের কারণে। সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হওয়ার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের এক নতুন স্ড়রে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যে সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার বিস্তৃতি হচ্ছে ২২ (বাইশ) হাজার কিলোমিটার। পুরো ক্যাবল নেটওয়ার্কে মাত্র দুই জোড়া ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহৃত হচ্ছে। এর একজোড়া এক্সপ্রেস এবং অপর জোড়া শাখা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের টুয়াস থেকে শুরু করে এই ক্যাবলের যাত্রা শেষ হবে ফ্রান্সের মার্সেই শহরে গিয়ে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন থাকবে ১১টি—মূল ক্যাবল থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত শাখা ক্যাবলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার দুইশত ষাট কিলোমিটার। বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে এই ক্যাবল থেকে যে ক্ষমতা পারে তার পরিমাণ 10 GB per second। সহজভাবে বললে বলা যায়, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে এক সঙ্গে ১ (এক) লক্ষেরও বেশি লোক টেলিফোনে কথা বলতে পারবে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ড ৬৪ কিলোবাইট গতিতে একযোগে যেখানে মাত্র দুই হাজার চ্যানেলে তথ্য যোগাযোগ সম্ভব—সেখানে সাবমেরিন ক্যাবল লিংক স্থাপনের ফলে সেকেন্ডে কমপক্ষে ১ (এক) হাজার চ্যানেলে যোগাযোগ করা যাবে। এর ডাটা ট্রান্সফার গতি হবে কমপক্ষে সেকেন্ড ১ গিগাবাইট। স্যাটেলাইটের ৬৪ হাজার মাইলের দূরত্ব চলে আসবে মাত্র কয়েকশ' মাইলের মধ্যে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের তুলনায় সাবমেরিন ক্যাবল-এর মাধ্যমে ভয়েস এবং ডাটা ট্রান্সফার অনেক দ্রুততর, সুলভ ও উন্নতমানের হবে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কলের মান আরও উন্নত হবে, দ্রুত সংযোগ পাওয়া যাবে এবং কলরেটও কমে আসবে। দেশে ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে, এর স্পিড বেড়ে যাবে। ব্রড ব্যান্ডে বর্তমানের চেয়ে ২ থেকে ৪ গুণ বেশি স্পিড পাওয়া যাবে।

সাবমেরিন ক্যাবল আমাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনাময় সুযোগ এনে দিয়েছে। দেশে যদিও মোবাইল ফোনের দ্রুত প্রসার ঘটছে, কিন্তু শুধু আন্তর্জাতিক ভয়েস দ্বারা সাবমেরিন ক্যাবল-এর বিশাল ক্যাপাসিটির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে যুবসমাজ তথ্যপ্রযুক্তিমনস্ক হবে, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারিত হবে এবং উদ্যোক্তাগণ তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন ব্যবসা ও সার্ভিস গ্রহণ করবেন। এটা সম্ভব হলে একদিকে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, অপর দিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে; আর তাতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাই স্বল্প সময়ে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের নাগালের মধ্যে এ সুযোগ পৌঁছে দিতে পারলেই আমাদের Submarine cable network এ যুক্ত হওয়া সার্থক হবে।

অনেকের কাছে আবার তথ্যপ্রযুক্তি হচ্ছে একটি বিনোদন মাধ্যম। কেননা সময় কাটানোর জন্য এটি একটি সহজ মাধ্যম। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষামূলক ও

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারি। এমনকি একটি টিভি কার্ড সংযোগের মাধ্যমে আমরা টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালাও দেখতে পারি। শহরগুলোতে আজকাল খেলার মাঠের সমস্যা অবর্ণনীয়। তাই শিশু-কিশোররা আজকাল কম্পিউটার গেম নিয়ে ব্যস্ড় হয়ে পড়েছে। শহরকেন্দ্রিক সভ্যতায় কম্পিউটার গেম বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রভাব বিস্ড়ার করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি কম্পিউটার একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। সহজ কথায় বলা যায় বর্তমান যুগ হচ্ছে ইন্টারনেটের যুগ এবং এই ইন্টারনেট ছাড়া পুরো পৃথিবীটাই প্রায় অচল। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে ই-মেইল পাঠাতে পারি। মাত্র ২-৩ সেকেন্ড সময়ে একটি ই-মেইল পাঠানো যায়। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের যে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি অর্থাৎ চ্যাট করতে পারি। কিশোর-কিশোরী এবং তর"ণ-তর"ণীর মাঝে চেটিং বিনোদনের একটি সহজ মাধ্যম হিসেবে দেখা দিয়েছে।

শুধু তাই নয় তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিনোদন আন্ড়র্জাতিকতা লাভ করেছে। যেমন আমাদের দেশের বাউল গান বা পলি- গানকে ইন্টারনেটে প্রচার করে আমরা তাকে আন্ড়র্জাতিকতা যেমন দিতে পারছি তেমনই ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার বহুল আলোচিত গানগুলোকে ইচ্ছে করলে আমরা শুনতেও পাচ্ছি। শুধু তাই নয় দেশের এক অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সেই স্থানে না গিয়ে অন্য অঞ্চলে বসেও উপভোগ করতে পারছি। এর ফলে বিনোদনের উপকরণ আমাদের কাছে সস্ড়া ও সহজলভ্য হচ্ছে। অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। অনেকের কাছেই বই পড়া একটি প্রধান শখ। কিন্ড়ু একটি বইয়ের দাম যেমন চড়া তেমনই বিদেশি বই হলে তা সহজলভ্য নয়। কিন্ড়ু বর্তমানে অনেক ভালো বই-ই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। অতি সম্প্রতি বিশ্বে ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি হয়েছে। এসব লাইব্রেরি বই-এর পরিবর্তে কমপেক্ট ডিস্কে বা ইন্টারনেটে পুস্ড়কাদি সংরক্ষণ করছে।

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণার গুর"ত্ব কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না। বর্তমানে যারা তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ, বাস্ড়বেও তারা ততবেশি অগ্রসর। তথ্যপ্রযুক্তির সমৃদ্ধির ওপরই উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভরশীল। দেশকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যুবসমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, বর্তমান হারে পরিবেশ দূষণ অব্যাহত থাকলে অচিরেই পৃথিবী নামক গ্রহটি ধ্বংস হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হবে মানব সভ্যতা। ফলে অস্তিত্বের তাগিদে মানুষ আজ পরিবেশ সংরক্ষণে সোচ্চার হচ্ছে, গড়ে উঠছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। আবিস্কৃত হচ্ছে পরিবেশ দূষণমুক্তির বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি।

আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবেশ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দান বা অনুগ্রহ নয়; বরং তা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর এক অনন্য সৃষ্টি। এ পরিবেশ সত্যান্বেষীদের সঠিক পথের দিঙনির্দেশনা দেয়। যেমন সূর্যের আলো যদি একটু কম হতো তাহলে পৃথিবী বরফে আচ্ছাদিত থাকতো, আবার সূর্যের আলো যদি সামান্য বেশি হতো তাহলে পৃথিবী হয়ে উঠতো উত্তপ্তময়। আর এ উভয় অবস্থায়ই পৃথিবীতে কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারতো না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা পরিবেশকে সকল জীবের উপযোগী করে সুষম ভারসাম্যে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরানে আল- াহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে : 'আমি প্রত্যেক বস্তুকে সুষমভাবে এবং পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি (সুরা আল কামার : ৪৯)। পরিবেশ দূষণ দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এর একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক আর অন্যটি মানব সৃষ্ট। প্রাকৃতিক দূষণ প্রক্রিয়া প্রকৃতিগতভাবেই পরিশোধিত হয়। যেমন মানুষ নিশ্বাসের মাধ্যমে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে পরিবেশকে দূষিত করে। কিন্তু প্রকৃতি নিজেই বৃক্ষরাজির মাধ্যমে এই গ্যাসকে গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে। অপরদিকে মানব সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। তার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে:

ক. গাছ কাটা ও বন উজাড় করা, খ. যেখানে সেখানে মলমূত্র ও ময়লা ফেলা, গ. কলকারখানার বর্জ্য, ঘ. গাড়ির কালো ধোঁয়া, ঙ. নদীনালার স্বাভাবিক গতিতে বাধা সৃষ্টি করা, চ. নির্বিচারে পশুপাখিসহ অন্যান্য প্রাণী শিকার ও নিধন করা ছ. পারমাণবিক বর্জ্য জ. রাসায়নিক বর্জ্য, ঝ. পলিথিনের যথেচ্ছ ব্যবহার, ঞ. নির্বিচারে পাহাড় কাটা প্রভৃতি।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে: 'আর তিনি (আল- াহ) জমিনের বুকে স্থাপন করেছেন ভারী পর্বতমালা, যেন তা তোমাদের নিয়ে এক দিকে ঝুঁকে না পড়ে'। অথচ মানুষ প্রতিনিয়ত পাহাড় কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। একইভাবে

আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য শিল্পের প্রসারকল্পে ধ্বংস করা হচ্ছে বনাঞ্চল। দূষিত করা হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিশুদ্ধ বায়ু, পানি ও মাটিকে। মোটরযানের জ্বালানি থেকে বাতাসে মিশ্রিত ক্ষতিকারক কার্বন মনোক্সাইড হিমোগে- াবিনের ওপর আক্রমণ করে। ফলে রক্তের প্রবাহ ক্ষমতা কমে যায়; নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ চোখ, নাক, শ্বাসনালি এবং ফুসফুসকে আক্রান্ড় করে, পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ক্যান্সার সৃষ্টি করে; সালফার-ডাই-অক্সাইড হাঁপানি ও ক্রনিক ব্রংকাইটিস সৃষ্টি করে, জ্বালানিতে ব্যবহৃত লেডের প্রভাবে মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ড় হয়, বিশেষ করে প- াম্বোসিস রোগ হয়। কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রভাবে ফুসফুসের ক্যান্সার ও শ্বাসনালির বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে পেপার মিলের মুক্ত ক্লোরিন, সিরামিক প- ান্টের ফ্লোরাইড, গ্যাস ফিল্ডের মারকেপ্টান, চামড়া মিলের টাইটারিক এসিড, লন্ড্রির ক্ষার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানার শ্বেতসার, সার কারখানার ফসফেট, ফটোগ্রাফির সিলভার, রাবার প- ্যান্টের জিংক, ওষুধ তৈরির কারখানা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করছে। এসব দুর্গন্ধময় এবং জীবাণুযুক্ত পানির মাধ্যমে টাইফয়েড, আমাশয়, হেপাটাইটিস এবং বর্তমানে আর্সেনিকোসিস ডিজিজ (পানিতে অত্যাধিক আর্সেনিক থাকার কারণে রোগ) দেখা দিচ্ছে। এসব দূষণ ক্রিয়ার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট।

শীত প্রধান দেশে কাচ দ্বারা ঘর তৈরি করে সেখানে বৃক্ষরোপণ করে গবেষণা ও চাষাবাদ করা হয়। এসব ঘরকে বলা হয় গ্রিন হাউস। গ্রিন হাউসের কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে কিন্ড়ু তার সবটুকু তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। কেননা গ্রিন হাউস বেশ কিছুটা তাপ ধরে রাখতে সক্ষম—আর এটাই গ্রিন হাউসের বৈশিষ্ট্য। শীত প্রধান দেশে যে সব ফসল উদ্ভিদ চাষে অত্যধিক তাপের প্রয়োজন হয় সে সমস্ড় ফসল উদ্ভিদ চাষাবাদ ও গবেষণা সাধারণত কাচ দিয়ে ঘর তৈরি করে তাতেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বায়ুমন্ড়লে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) প্রভৃতি গ্যাস সূর্য থেকে আগত তাপের কিছু অংশকে ধরে রেখে এবং কিছু অংশকে মহাকাশে ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করছে। যেসব গ্যাস সূর্য থেকে আগত তাপকে ধরে রাখে তাদেরকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস। এসব গ্রিন হাউস গ্যাস স্টেটোস্পিয়ারে তাপকে ধরে রাখছে বলেই পৃথিবী উষ্ণ রয়েছে। তা নাহলে অনেক আগেই আমাদের এ পৃথিবী শীতল হয়ে বরফ পিন্ড়ে পরিণত হতো। আর বিলুপ্ত হয়ে যেত পৃথিবীর সভ্যতা।

কিন্ড়ু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কল কারখানা, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, মোটরযান, জলযান প্রভৃতিতে খনিজ জ্বালানি, ইটের ভাটা ও এরোসলে স্প্রে ক্যান ব্যবহারের

ফলে প্রকৃতিতে বেড়ে চলছে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ। আবহাওয়া ম-লে অত্যধিক গ্রিন হাউস গ্যাসের কারণে বিকিরণ কমে যাচ্ছে ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে আবহাওয়া ম-লের তাপমাত্রা। পৃথিবী দিন দিন হচ্ছে উত্তপ্ত। বিজ্ঞানীরা এরই নাম দিয়েছেন গ্রিন হাউস ইফেক্ট। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর প্রভাবের শতকরা হার হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ৪৯%, মিথেন ১৮%, সিএফসি ২৪%, নাইট্রাস অক্সাইড ৬% এবং অন্যান্য গ্যাস ১৩%।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ড় (কোথাও কম কোথাও বেশি) বায়ুম-লকে ওজোনোস্ফিয়ার বলে। এ স্ড়রে রয়েছে ওজোন নামক একটি গ্যাস। এ গ্যাস আবার অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু সমন্বয়ে সৃষ্ট। যাকে কি না অক্সিজেনের রূপভেদ বলে। বেশ কয়েক কিলোমিটার পুরো এ স্ড়র। এ স্ড়রের প্রধান কাজ হচ্ছে সূর্য রশ্মির সঙ্গে আগত অতি বেগুনি রশ্মির শতকরা ৯৯ ভাগ শোষণ করে নেওয়া। ওজোন গ্যাসের এ বিশাল স্ড়র না থাকলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তো। ফলে জীব জগতের অস্ড়িত্ব বিলীন হয়ে যেতো। কেননা অতি বেগুনি রশ্মি জীবনের প্রধান উপাদান কর্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের বিনাশ সাধন করে। এমনকি উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ ও ডিএনএ অণুর অর্থাৎ জীবনের কার্যক্রমও এর হাত থেকে রেহাই পায় না। এ রশ্মির অতিরিক্ত প্রভাবে ক্যান্সার জাতীয় রোগ দেখা দেয়। তদুপরি উদ্ভিদের সালোক সংশে- ষণের হার কমে যায়। এজন্যেই বায়ুম-লে নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত গ্রিন হাউস গ্যাস থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্ড়ু বর্তমানে পৃথিবীতে গ্রিন হাউস গ্যাসে পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে এন্টার্কটিকার ওপর ওজোন স্ড়রে এমন এক ফাটল ধরেছে যার আয়তন পৃথিবী নামক আমাদের এ গ্রহের থেকেও বড়।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ আর দ্বিমত নেই যে, আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ দ্র-ত বদলে যাচ্ছে এবং পরিবেশের পরিবর্তনগুলো জীব প্রজাতির জন্যে মোটেও অনুকূল হচ্ছে না। সভ্যতার শুর- থেকেই মানুষ তার চারপাশের পরিবেশকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করে চলেছে। কিন্ড়ু বর্তমানে প্রকৃতির ওপর মানুষের অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, প্রকৃতি মানুষের প্রতিকূলে তার নিজের পরিবর্তনের মাধ্যমে যেন নীরব প্রতিবাদ করতে শুর- করছে। ফলে পৃথিবীর আচ্ছাদন স্ড়রে ঘটছে এক দ্র-ত পরিবর্তন। বিশ্ব পরিবেশে মানব সৃষ্ট ক্ষতিকর পরিবর্তনের নিশ্চিত আভাস প্রথমবারের মতো পাওয়া যায় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। এ সময় ব্রিটিশ মিটিওরোলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানী যোসেফ ফোরম্যান ও তার সহযোগীরা বিজ্ঞান বিষয়ক আন্ড়র্জাতিক পত্রিকা 'ন্যাচার' এ উলে- খ করেন, এন্টারর্কটিকার ওপর স্ট্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনের মাত্রা ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ১৯৬০ দশকের তুলনায় ৪০% কমে গেছে। কুমের-

অঞ্চলের ওজোন স্তরে সৃষ্ট গর্তের কারণ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাশনাল ওসানিক অ্যান্ড এটমোস্ফিয়ারিক এডমিনিস্ট্রেশন, বিজ্ঞানী সুসান সলোমনের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করে। তারা পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ড করা ওজোন স্তরের ঘনত্বের চেয়ে বর্তমানে (১৯৮৬) এর মাত্রা ৫০% এর চেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। তারা আরও দেখতে পান যে, কুমেরুর আকাশে ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোন স্তর ৯৫% এর চেয়ে বেশি লুপ্ত হয়েছে। শুধু কুমেরুর আকাশেই নয় অতি আধুনিক সকল নগরীর আকাশেও ওজোন-এর পরিমাণ ব্যাপক হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বজন স্বীকৃত যে, স্ট্যাটোস্ফিয়ারে প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ক্লোরিন ও ব্রোমিনসহ শিল্প কারখানা থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক বিশেষ উপাদানের বিক্রিয়া রাসায়নিক উপায়ে ওজোন অণু ধ্বংস করে থাকে। ওজোন অণুর ধ্বংসের ব্যাপারে যে গ্যাসটির কথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় তা হলো সিএফসি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবিস্কৃত এ গ্যাসটি বিষক্রিয়াহীন ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সহজে অন্য পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। নিম্ন তাপমাত্রায় এ গ্যাসটি বাষ্পীভূত হয় বলে ফ্রিজ, এয়ারকুলার প্রভৃতিতে হিমায়নের কাজে এবং এ্যারোসল-এর স্প্রে ক্যাপ-এ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সিএফসি সংগ্রহ ও তৈরি করাও সহজ। সিএফসি ট্রাপোস্ফিয়ারে অক্ষত অবস্থায় থেকে যায় এবং ভালোভাবে মিশে থাকে। সিএফসি-১১ এবং সিএফসি-১২ এর ট্রাপোস্ফিয়ারে মেশার অনুপাত যথাক্রমে ১৯০ ও ৩৫০ ভাগ এবং প্রতিবছর এদের ঘনত্ব ৫-৮% বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে গিয়ে সিএফসি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে গিয়ে মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু সৃষ্টি করে। এই মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। ফলে ক্লোরিন মনোক্সাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন। উৎপন্ন ক্লোরিন মনোক্সাইড পুনরায় মুক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মুক্ত ক্লোরিন ও অক্সিজেন অণুতে পরিণত হয় এবং এই প্রক্রিয়া বারবার চলতে থাকে। ফলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে মুক্ত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সিএফসি থেকে নির্গত ক্লোরিন পরমাণু ১ লাখ ওজোন অণুকে ভেঙে দিতে পারে। তাছাড়া স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যেহেতু প্রবল সমান্তরাল বাতাস প্রবাহিত হয় সেজন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিএফসি ব্যাপকভাবে সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সিএফসি-১১৩ নামে অন্য একটি ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের সঞ্চয় বায়ুমন্ডলে প্রতিবছর ১১% বেড়ে চলছে। এছাড়াও রকেট জ্বালানি থেকে ক্লোরিন সরাসরি স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পৌঁছে এবং ওজোনকে ধ্বংস করে। যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশ রক্ষা সংস্থা ইপিএ এর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ১% ওজোন ক্ষয়ের জন্য ত্বকের ক্যান্সার হবার হার ২% বেড়ে

যায়। তাছাড়া ওজোন স্ড়র ক্ষয় প্রাপ্তির জন্য অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদ, প্রাণী, পাখি এমনকি শৈবাল ও উদ্ভিদ প- াংকটনেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয। ওজোন স্ড়র হালকা হওয়া ও গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবী ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্কটিক আইসল্যান্ডসহ পৃথিবীর বড় বড় পাহাড় ও পর্বত চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলতে শুর" করেছে। বাড়ছে সমুদ্রের জলরাশি। ফলে দ্বীপ-দেশসমূহ এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের উপকূলবর্তী এলাকা পানিতে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বায়ুম"লের তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বিশ্ব পরিবেশের যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তা আজ স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে। আজকের দিনে ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশেও বন্যার প্রকোপে হাজার কোটি ডলার ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এমন বিধ্বংসী বন্যা সেসব দেশের লোক এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। পৃথিবীকে আঘাত করছে সুনামি, সিডর নামক প্রলয়ংকারী সব দুর্যোগ। তাছাড়া দেশে দেশে বেড়ে চলছে খরা, সেই সঙ্গে মর"করণ প্রক্রিয়া। ফলে অবশ্যম্ভাবী এক চরম পরিণতির দিকে এগুচ্ছে আমাদের এ ধরিত্রী।

গ্রিন হাউস ইফেক্টের এ মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরিবেশ দূষণ রোধ করে তাকে নির্মল রাখার ব্যবস্থা করা। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আজ এ বিষয় নিয়ে সদা সতর্ক। তারা বলেছেন, পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা। কেননা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ পানি, মাটি ও বায়ুর ওপর বাড়ছে প্রচ" চাহিদার চাপ। বনজ সম্পদ নষ্ট করে তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য এসে পৌঁছেছে এক সংকটময় অবস্থায়। অপরদিকে প্রযুক্তির ব্যবহারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ পরিমাণ ব্যবহার জীবকুলের জীবনকে যেভাবে বিপন্ন করে চলছে তা প্রজাতির অবলুপ্তির মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী প্রজাতি বিশেষ করে মাছ, ব্যাঙ, সাপ, শামুক, ঝিনুক, পাখির অবলুপ্তি ঘটছে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণের। এগুলো হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার প্রধান অভিশাপ। অপরদিকে প্রতিনিয়ত গাড়ির শব্দ, কল কারখানার শব্দ, বাজি-পটকা, রেডিও-টিভির শব্দ সৃষ্টি করছে দূষণের। সব মিলিয়ে যেন এক বীভৎস পরিবেশ।

এ বীভৎস পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে বসবাসের উপযোগী করতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনায়ন সৃষ্টি। কেননা উদ্ভিদরাজির কারণেই আমরা বেঁচে আছি। উদ্ভিদরাজি বাতাস থেকে আমাদের উচ্ছিষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে তাকে সূর্যালোকের মাধ্যমে নিজের খাদ্যে পরিণত করছে। অপরদিকে মানব জাতির জন্য সরবরাহ করছে নির্মল

অক্সিজেন—যা আমরা প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহার করছি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, উদ্ভিদরাজি প্রতিনিয়ত অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুকে নির্মল রাখছে বলেই এ পৃথিবীতে প্রাণিকুল টিকে আছে। তাছাড়া বৃক্ষরাজি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব বনজসম্পদ পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিও সাধন করে তাকে। আবহাওয়া আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ রাখা, বৃষ্টিপাত ঘটানো, ভূমিক্ষয় রোধ করা, বন্যার হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা, ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় রোধ করা সর্বোপরি জমিকে উর্বর করার পেছনে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় রয়েছে বৃক্ষরাজি। কাজেই বৃক্ষরাজি ধ্বংস না করে তাকে টিকিয়ে রাখার পেছনেই রয়েছে প্রাণিকুলের টিকে থাকার সম্ভাবনা। পরিবেশবিদরা বলেন, একটি দেশকে পরিবেশদূষণ থেকে রক্ষা করতে হলে সে দেশের আয়তনের ন্যূনতম ২৫% এলাকায় বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। কিন্ডু আমাদের দেশে ১০ শতাংশ বনাঞ্চল আছে কিনা সন্দেহ। তাই আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্যে হারিয়ে যেতে বসেছে পৃথিবী নামক গ্রহের নির্মল পরিবেশ। পৃথিবীর এ দূষিত পরিবেশকে নির্মল করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে গাছপালা। গাছের পাতার লাখো লাখো কোটি কোটি ছিদ্র ধরে রাখতে পারে বিষাক্ত গ্যাস ও ধূলি আর সরবরাহ করতে পারে আমাদের জন্য বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান নির্মল অক্সিজেন। সুতরাং নিজেদের বেঁচে থাকা ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে আজকের দিনে আমাদের বৃক্ষরোপণের প্রতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। এছাড়াও আমাদের অবিলম্বে যে কাজগুলো করতে হবে তা হচ্ছে (ক) সিএফসি উৎপাদন বন্ধে এর বিকল্প উদ্ভাবন করা (খ) কাঠ, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির পরিবর্তে হাইড্রোজেন নির্ভর জ্বালানি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া, (গ) খনিজ তেলের ব্যবহার কমানোর জন্য সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং (ঘ) প্রচারণার মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এসব কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে তারা হচ্ছে এদেশের যুব সম্প্রদায়। কেননা ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় তারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তারা যুগোপযোগী নানা কর্মসূচি হাতে নিয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ আন্দোলনে দৃষ্টান্ড় স্থাপনকারী উদ্দীপনা যোগাতে পারে। তারুণ্যদীপ্ত এ যুব সম্প্রদায়ই বাংলাদেশের আগামী দিনের ভরসা।

শব্দদূষণ

ভৌত পরিবেশে (বিশেষত বায়ু মাধ্যম) শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন শব্দের উপস্থিতিতে জীব-পরিবেশ তথা মানুষের ওপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, পরিবেশ সংক্রান্ত সেই ঘটনাকে শব্দদূষণ বলা হয়। বজ্রশব্দ ও মেঘের গর্জন হচ্ছে শব্দদূষণের প্রাকৃতিক কারণ আর বাস, লরি, কার বা ট্রেনের হর্নের শব্দ, চালু মেশিনের শব্দ, জেনারেটর চলার শব্দ, বিমান উড়বার সময়ে উৎপন্ন শব্দ, মাইক বা সাইরেনের শব্দ, আতশবাজি ইত্যাদির শব্দ হচ্ছে শব্দদূষণের জন্য মনুষ্য সৃষ্ট কারণ। তাই বলা যায় মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপই শব্দদূষণের প্রধান কারণ। শব্দদূষণজনিত সমস্যা ইদানীংকালে আরও প্রকট হয়ে উঠছে। বাস-ট্রাকের বেপরোয়া শব্দ ও হর্ন বাজানোর শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তাছাড়া উচ্চ শব্দে গান বাজানো, নির্মাণ কাজের সময় বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার, মাইকের অতিরিক্ত শব্দ প্রভৃতি শহরাঞ্চলে প্রতিনিয়ত শব্দকে দূষিত করছে।

আমরা জানি, শব্দ তরঙ্গ বায়ুর সাহায্যে বাইরের কানের গহ্বরে প্রবেশ করে কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পন মধ্যবর্তী কানে অবস্থিত তিনটি অস্থির স্পর্শে আরও প্রবল হয় এবং কানের ভেতরে প্রবেশ করে। তখন শ্রবণ কোষ শব্দকে শ্রবণ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই। কাজেই বলা যায় কানের পর্দা ছাড়া শ্রবণেন্দ্রিয় সবল হয় না। কিন্তু শব্দ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে শ্রবণেন্দ্রিয়ে আঘাত লাগে এবং কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কানের পর্দা ফেটে গেলে মানুষ আর শুনতে পায় না।

এক মিটার দূরত্বের মধ্যে দু'জন মানুষ স্বাভাবিক স্বরে কথা বললে শব্দ উৎপন্ন হয় ৫০ ডেসিবেল। ডেসিবেল হচ্ছে শব্দের তীব্রতা মাপনের স্কেল। এটি 'অ্যাকাসটিক্যাল সোসাইটি অভ আমেরিকা'-কর্তৃক নির্ধারিত এবং এ স্কেল অনুযায়ী শব্দের তীব্রতা ০-১৪০ ডেসিবেল পর্যন্ত ধরা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সাধারণভাবে ৬০ ডেসিবেল শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে বধির করে ফেলতে পারে এবং ১৪০ ডেসিবেল শব্দ সম্পূর্ণ বধিরতার কারণ হতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে, যানবাহন থেকে উৎপন্ন শব্দ ৯০-১০০ ডেসিবেল, মাইক্রোফোনের শব্দ ৯০-১০০ ডেসিবেল, কলকারখানা শব্দ ৮০-৯০ ডিসেবেল, সিনেমা হলের শব্দ ৭৫-৯০ ডেসিবেল, উৎসব অনুষ্ঠানের শব্দ ৮৫-৯০ ডেসিবেল, বেবিটেক্সি ও মোটর সাইকেলের শব্দ ৮৭-৯২ ডেসিবেল, সাইরেনের শব্দ ১৩০-১৪০ ডেসিবেল। কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত শব্দ তীব্রতা শয়নকক্ষে ২৫ ডেসিবেল, ড্রয়িং রুমে ৪০ ডেসিবেল, অফিসে ৩০-৪০ ডেসিবেল, রেষ্টুরেন্টে ৪০-৬০ ডেসিবেল, ক্লাসরুমে ৩০-৪০ ডেসিবেল,

লাইব্রেরিতে ৩৫-৪০ ডেসিবেল, হাসপাতালে ২০-৩৫ ডেসিবেল এবং রাতের শহরে ৪৫ ডেসিবেল হওয়া উচিত। এ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা দূষণের পর্যায়ে পড়ে এবং মানুষের শ্রবণশক্তিকে ধীরে ধীরে বা হঠাৎ ধ্বংস করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনবছর বয়সের নিচে কোন শিশুর কানে যদি খুব কাছে থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ আসে, তাহলে তার শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাসায় আমরা অনেকেই রেডিও, টিভি বা টেপ রেকর্ডার বাজাই জোরে শব্দ করে। অথচ এর শব্দ উৎপন্ন হয় ৮০-১০০ ডেসিবেল। বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রমাগত ৮ ঘণ্টা ৮০-৯০ ডেসিবেল শব্দের মধ্যে বসবাস করলে ২৫ বছরে সম্পূর্ণ বধির হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১০০%। এছাড়া শব্দদূষণ শুধু বধিরতা সৃষ্টিই নয় আরও অনেক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে- হৃদ স্পন্দনের পরিবর্তন, ধমনি রক্তচাপের বৃদ্ধি, রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস, রক্তের গ- ুকোজের স্বাভাবিক মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি, রক্তের ইওসিনোফিল নামক দানাযুক্ত শ্বেত কণিকা সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্বসনের হার পরিবর্তন, রাত্রিকালীন দৃষ্টি ত্র"টি, চোখের পিউপিল রন্ধ্রের প্রসারণ, বর্ণ প্রত্যক্ষকরণ হ্রাস, অডিটরি নার্ভের ক্রিয়া হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাত, মাথা ধরা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে শব্দদূষণ অনেকটা নীরবে এবং খুব ধীরে ধীরে আমাদের ক্ষতি করে থাকে।

বিভিন্ন দেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে যখন লক্ষণীয় অগ্রগতি হচ্ছে এবং দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে, বাংলাদেশে তখন আমরা প্রায় বিপরীত পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। শব্দদূষণকে মোকাবিলা করার পরিবর্তে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মরণব্যাধির দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এ ব্যাধিগুলো হচ্ছে বধিরতা থেকে হৃদরোগ পর্যন্ড়। শহরের অবস্থা অত্যন্ড় হতাশাজনক। বাস, ট্রাকগুলোর অকারণে হর্ন এবং হাইড্রোলিক হর্নের কারণে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের, বিশেষত শিশুর শ্রবণ ক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে। অথচ আমরা এ ব্যাপারে মোটেও চিন্ড়া করছি না। প্রতিদিন জেনে না-জেনে আমরা শব্দকে দূষিত করে চলছি। আমার কাজে সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে এই বোধ আমাদের নেই। তাই তো প্রতিনিয়ত আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ তৈরি করে নির্দ্বিধায় সমাজের ক্ষতি করে চলছি। তাই আমাদের ভেবে দেখা উচিত নিজের কিংবা অপরের ক্ষতি করার অধিকার আমার আছে কি-না?

শব্দদূষণের সঙ্গে পরিবেশদূষণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হলে পরিবেশকে অবশ্যই দূষণমুক্ত করতে হবে। এজন্য পরিবেশদূষণের অন্যান্য কারণের পাশাপাশি শব্দদূষণের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শব্দদূষণ যে আমাদের সমূহ ক্ষতি করছে, এ বিষয়টি জনগণের বিশেষত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিতদের মাঝে তুলে ধরতে হবে। কী কী কারণে শব্দ দূষিত হচ্ছে এবং এ

দূষণের ফলে আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রচার করতে পারলেই কেবল জনগণ এর প্রতিকারে এগিয়ে আসবে।

শব্দদূষণ কোন ব্যক্তির সমস্যা নয় এটি একটি সামগ্রিক সমস্যা। এমন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন যৌথ ও সম্মিলিত উদ্যোগ। শুধু সরকারের আশায় বসে না-থেকে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শব্দদূষণ প্রতিরোধে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। আর আমরা ফিরে পাব আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া নির্মল প্রকৃতি।

পানি : বর্তমান শতাব্দীর হাহাকার

আল- াহ রাব্বুল আলামিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পানি যার অপর নাম জীবন। পবিত্র কোরানে আল- াহতা'য়ালা বলেছেন—'আমি পানি থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেছি'। এ পানিই বিশ্ব পরিবেশের এক অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে একমাত্র পানি ছাড়া এমন কোন বস্ড়ু নেই যা একাধারে বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন ও নিরপেক্ষ। পানির প্রধান রহস্যময় ধর্ম হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মে তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে পানির ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ হয়ে আবার কমতে থাকে। পানি নিরপেক্ষ হলেও পানীয় দ্রবণের অস্বাভাবিক ধর্ম হয়েছে। আর এ অস্বাভাবিক ধর্মগুলো পানিকে রহস্যময় করে তুলেছে বিজ্ঞানীদের কাছে। পানি বিশে- ষণ করে দেখা গেছে, ১ (এক) পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে ২ (দুই) পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে ১ (এক) অণু পানি তৈরি করে। রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় পাওয়া গেছে পানিতে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু ৪ (চার)টি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা চতুস্ড়লকীয়ভাবে পরিবেষ্টিত থাকে এবং প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের নিউক্লিয়াস থেকে ১.২৪A^0 দূরত্বে এবং প্রতি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর থেকে ০.৭৫A^0 দূরত্বে এবং প্রতিটি অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু ০.৯৬A^0 দূরত্বে অবস্থান করে। আমরা জানি, শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হয়। এই বরফের স্ফটিক একটি গুচ্ছ পানি অণু। এ কারণে বরফের সংকেত $(H_2O)_n$ ধরা হয়। এই গঠনে বরফের স্ফটিকে বহু ফাঁকা জায়গা থাকে। তাই বরফের ঘনত্ব পানির তুলনায় কম। আর এজন্যেই কঠিন পানি অর্থাৎ বরফ তরল পানিতে ভাসতে পারে। পানিতে প্রতিটি হাইড্রোজেন-অক্সিজেন-হাইড্রোজেন বন্ধন কোণের মান হচ্ছে ১০৪.৫ ডিগ্রি অথচ এর মান স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া উচিত ছিল ১০৯.৫°। তদুপরি পানি যদিও নিরপেক্ষ তবু পানির মের"প্রবণতাও পানির ধর্মের ওপর গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে পানির এ মের"প্রবণতার কারণে পানির মধ্যে কোন বস্ড়ুর দ্রবণের বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। প্রোটিন, কাবহাইড্রেট, ডিএনএ প্রভৃতি পানির সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে। ফলে এগুলো পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং আমাদের শরীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নিয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে।

আধুনিক সভ্যতায় পানি শুধু জীবনের জন্যই গুর"ত্বপূর্ণ নয় বরং কৃষি, শিল্প, শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ দৈনন্দিন কাজেও ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে জীবনের জন্য যে পানি এতো গুর"ত্বপূর্ণ সে পানি নিয়ে ইতোমধ্যেই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমান শতাব্দীতে পানি সংকটের সৃষ্টি হবে। পৃথিবীর প্রায় চারভাগের তিনভাগ পানি,

কিন্তু এ পানির প্রায় ৯৭% সমুদ্রে অবস্থানজনিত কারণে নোনা ও অপেয়, প্রায় ২% মেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বরফ এবং মাত্র ১% সুপেয়—যা মানুষের ব্যবহার উপযোগী। এ ব্যবহার উপযোগী পানির প্রায় ৭০% ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে, ২৫% ব্যবহৃত হয় শিল্প কারখানা এবং মাত্র ৫% ব্যবহৃত হয় মানুষের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজসহ পানীয় হিসেবে। কিন্তু মানুষের ব্যবহার উপযোগী এ পানি পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। কোথাও পানির প্রাপ্যতা খুব সহজ আবার কোথাও-বা ধু-ধু মরুভূমি। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৈষম্যপ্রবল। উত্তর আমেরিকা ও জাপানে মাথাপিছু প্রতিদিন পরিষ্কার পানির ব্যবহার যেখানে ৬০০ লিটার, ইউরোপে ২৫০-৩০০ লিটার, সেখানে সাব-সাহারা অঞ্চলে সে পরিমাণ ১০-২০ লিটারে সঙ্কুচিত।

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ব্যবহার উপযোগী পানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রবাহিত নদনদী ও হ্রদ—যা মানুষের বসতির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। ফলে ব্যবহার উপযোগী পানি মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে এবং পরিষ্কার পানির উৎস সঙ্কুচিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে এ দূষণ ঘটছে শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে আর অনুন্নত বিশ্বে এ দূষণ ঘটছে প্রধানত মানুষের যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ ও ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে। তাই উন্নত ও অনুন্নত দু'বিশ্বেই সমভাবে প্রভাব পড়ছে পানিদূষণের। এ কারণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ আজ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে এসব রোগের কারণে।

আরও আতঙ্কজনক বিষয়, বিশ্বব্যাপী বৃষ্টিপাতের ঘাটতি এবং খরাজনিত কারণে নদী-হাওর-বাঁওড় শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বোপরি মানুষ-কর্তৃক সবুজ বলয় নিশ্চিহ্ন করার কারণে বিশ্বপরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে এবং পরিষ্কার পানির উৎস সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাই বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠী দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও রোগ যন্ত্রণার শিকার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পানিবিশেষজ্ঞ পিটার গি- কের মতে, বিংশ শতাব্দীতে বিশুদ্ধ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব নেতৃত্বের নিদারুণ অবহেলার কারণে পানিসংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই একবিংশ শতাব্দীতে পানযোগ্য পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কারণে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পানিসংকটের কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্টসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক জরিপ থেকে জানা গেছে, সারা বিশ্বের ৯৮টি উন্নয়নশীল দেশের ৭৯২ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ পাচ্ছে না। এমনকি

শিল্পোন্নত দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেক রাষ্ট্রের প্রায় ৩৪ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী বিশুদ্ধ পানির অভাবে অপুষ্টি এবং রোগযন্ত্রণার শিকার হয়েছে। পানি ঘাটতির কারণে তাজাকিস্ড়ান, আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, বুলগেরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইয়েমেন, ইরাক, মরক্কো প্রভৃতি দেশ পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যর্থতার কারণে চরম দুর্দশা কবলিত। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বিশ্বে ১০০ কোটির অধিক মানুষ প্রতিনিয়ত দূষিত পানি পান করছে, এর ফলে বছরে ৩৪ লাখের অধিক মানুষ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে; যাদের বেশিরভাগই হচ্ছে শিশু। বর্তমানে পানি কেবল স্বাস্থ্যগত সমস্যাই নয়, গণ অসচেতনতার ফলে এটি নিত্যদিনের বহুমুখী সমস্যা।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জাতিসংঘের বিশ্ব পানিউন্নয়ন প্রতিবেদনে উলে- খ রয়েছে, বিশ্বের ২৬১টি বড় আন্ড়র্জাতিক নদীর ৬০% এর ওপর কৃষি, সেচ বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এর নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাগণ এক অন্যায় পরিস্থিতির শিকার। আন্ড়র্জাতিক নদীর পানি নিয়ে এসব অববাহিকার বাসিন্দাদের পানির ন্যায্য হিস্যাপ্রাপ্তি এবং দূষণ নিয়ে বিতর্কের অভাব নেই। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্র বা একই রাষ্ট্রের উজানের শক্তিধর জনগোষ্ঠীর অসহযোগিতার মনোভাব এবং একক স্বার্থান্বেষী এমনকি বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপ মিঠা নিরাপদ পানিপ্রাপ্তির অধিকারে বঞ্চনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। পানির সংকট বাড়ায় বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানির প্রাপ্যতা ও অধিকার নিয়ে বিরোধ বাড়ছে। টাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস নদীর পানি নিয়ে তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে মতের ভিন্নতা স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। আবার চীন, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশের অভিন্ন নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের মহাপরিকল্পনা এ অঞ্চলে শুধু অস্থিরতাই নয় একই সঙ্গে পরিবেশের বিপন্নতাও ডেকে আনছে। পানি নিয়ে এভাবে বিভিন্ন ব্যবহারকারী দেশ, জনগোষ্ঠী ও জাতিগোত্র প্রধানত এশিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিরোধ যেভাবে তীব্রতর হচ্ছে তাতে পানি নিয়ে যুদ্ধের আশঙ্কা কোন অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলাদেশের ছোট-বড় প্রায় ২৩০টি নদীর মধ্যে ১৭৫টি নামে মাত্রই টিকে আছে। ফারাক্কা বাঁধ এবং দেশের ভেতরে যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণের কারণে এসব নদী পলি মাটিতে ভরাট হয়ে গেছে। এসব নদীতে পানিপ্রবাহ নেই বললেই চলে। অথচ এক সময় বাংলাদেশ ছিলো নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশ আপাতত ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে নদীগুলোর একতরফা পানি প্রত্যাহারের ঘাটতি সামাল দিচ্ছে। কিন্ড়ু ভূগর্ভস্থ পানির স্ড়র নেমে যাওয়ার কারণে এ ব্যবস্থা নদীর পানি হিস্যার বিকল্প স্থায়ী সমাধান নয়। ফলে বাংলাদেশ একদিকে গ্রিন হাউজ প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের

পানিস্ফীতির ক্ষতি এবং অপরদিকে মিঠা পানির প্রবাহ হতে বঞ্চনার শিকার হয়ে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

বর্তমানে ভূ-নিম্নস্থ পানিতেও দেখা দিয়েছে আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত ধাতব দূষণের। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এ সমস্যার সমাধানে দিশেহারা। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে অন্ড়ত ৫৯টি জেলায় আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গেছে। কাজেই আর্সেনিক দূষণের কারণেও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে। এসব দেশে অদূর ভবিষ্যতে অন্য যেকোন কারণের চেয়ে আর্সেনিকের কারণে ক্যান্সার আক্রান্ড় রোগির সংখ্যা বেড়ে যাবে। ক্যান্সার ছাড়াও আর্সেনিকের কারণে যকৃৎ, পাকস্থলী ও চামড়ার বিভিন্ন রোগ হতে পারে। আর্সেনিক কবলিত এলাকায় উৎপন্ন ফসলও আর্সেনিক বহন করে। আর সে কারণেই বাংলাদেশের মতো ধানপ্রধান দেশে আর্সেনিক আরও বেশি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। আর্সেনিকের ঝুঁকির তালিকায় বাংলাদেশের পরই রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য। যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পিটার র‍্যাভেনস্ক্রফট বলেন, আর্সেনিক সমস্যা এখন আর কোনো দেশ বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ৭০টি দেশের পানিতে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক রয়েছে। আর এসব দেশ থেকে উৎপন্ন ধানসহ অন্যান্য খাদ্যশস্যের কারণে আর্সেনিকের হুমকি থেকে কারও রেহাই নেই। আর্সেনিক দূষণের সবচেয়ে ভয়ানক দিক হলো, এ সম্পর্কে মানুষ এখনো সচেতন নয়। এমনকি আর্সেনিক দূষণের মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থার দেশগুলোতেও বিষয়টির প্রতি তেমন গুর"ত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

জাতিসংঘ-কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে ১৯৫০ হতে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পানির ব্যবহার ও চাহিদা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আসছে প্রতি ২১ বছরে মানুষের ব্যবহারের কাজে বর্তমানে ব্যবহৃত পানির দ্বিগুণ পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে। মানুষ আগেও ইচ্ছেমতো পানির ব্যবহার করেছে, কিন্ড়ু তখন কোন সমস্যা দেখা দেয় নি, কারণ তখন জনসংখ্যা ছিল কম। কিন্ড়ু এখন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এর অপব্যবহার। তাই পানি সমস্যা এখন আমাদের দোরগোড়ায়। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের জন্য পানিই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। উন্নত দেশগুলোর ভেতর জন্মাবে পানির সঞ্চয়ের হিংস্র মনোভাব। অস্ত্রের মাধ্যমে দখল করতে চাইবে বিশুদ্ধ পানির উৎস।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত জলবায়ুর পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। তাই অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হতে পারে। মানবসৃষ্ট এ দুর্যোগ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। চিন্ড়া করতেও ভয় হয় ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় ও দুর্যোগের কবলে পড়বে সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই

মাতৃভূমি। কিছু মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাে দেশের অনাগত ভবিষ্যৎ বিপন্ন। তাই সর্বস্ড়রের জনগণের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশি- ষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ একথা স্পষ্ট যে, একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ মারাত্মক পানিসংকটের সম্মুখীন হবে। এজন্যেই পানিসম্পদের গুর"ত্ব ও সীমিত উৎস বিবেচনায় মানুষের সচেতনতা গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। একইসঙ্গে বিশ্বের সকল মানুষকে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধ্বংস রোধ করতে হলে পরিমিত পানি ব্যবহার করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তবে আশার কথা বিশ্বের শান্ড়িকামী মানুষ ইতোমধ্যেই এ বিষয়ের প্রতি গুর"ত্ব দিতে শুর" করেছে। তাই লেসোথো—দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার পানি ভাগাভাগি ও ব্যবস্থাপনা সহযোগিতার চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করেছে। তাছাড়া নীলনদের পানি সহযোগিতামূলক বণ্টনের জন্য মিসর ও ইথিওপিয়া এবং সেনেগাল নদীর পানি শান্ড়িপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্য ফর্মুলা বের করতে সেনেগাল, মালি ও মৌরিতানিয়ার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

বিশ্বের সচেতন বাসিন্দা হিসেবে পানিসংকট মোকাবিলায় এমন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা উচিত যা নিশ্চিত করবে সকলের জন্য সুপেয় পানির প্রাপ্যতা এবং অবসান ঘটাবে ভয়াবহ যুদ্ধের।

মানব কল্যাণে শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজ বা দেশ অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের নতুন প্রজন্মকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে হলে প্রয়োজন সুশিক্ষার। আমরা যদি আমাদের নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলেই সমৃদ্ধ হবে আমাদের মাতৃভূমি, শান্ড়িতে বসবাস করতে পারবে আমাদের উত্তরসূরি।

সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় কোনো বিশেষ জ্ঞান বা কৌশল অথবা দক্ষতা অর্জন। এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠ্যপুস্ড়ককেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক দক্ষতার বিকাশ সাধন করা।

কিন্ড়ু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মাঝে সকল প্রকার সম্ভাবনা বা প্রতিভার স্ফুরণ ঘটানোর মাধ্যমে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী তার আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করা। অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানবজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ড় এক অনিমেষ প্রক্রিয়া। সুতরাং মানবজীবনের সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার নামই শিক্ষা।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, শিক্ষা হচ্ছে সমাজের জন্য কল্যাণকর শিখন। অপরদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগ্যতা ও নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির সেবা করার জন্য শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব এবং তারা স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব। তাই মানুষ একাকী বাস করতে পারে না। এজন্যই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী হবে, কেমন হবে, তা শিক্ষার্থীকে জ্ঞাত করা।

ড. কাজী দীন মোহাম্মদ বলেছেন, 'কল্যাণমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বাহ্য প্রকৃতি ও অভ্যন্ড়রীণ প্রবৃত্তি-এ দুই জিনিসের সার্থক অনুশীলনের মাধ্যমে জীবন সাধনায় ব্রতী হয়ে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থেকে স্রষ্টার বিধান অনুমোদিত পথে জীবনযাপন করে মহা প্রস্থানের পথে গমন করে। এটাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।'

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদিও এমন কিছু লোক সৃষ্টি করা যারা আদর্শ মানুষ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে সমর্থ হবে কিন্ড়ু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার দীর্ঘদিন অতিক্রান্ড় হলেও আমাদের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য তথা মানবিক মূল্যবোধ তথা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয় নি। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে জ্বলছে অশান্ড়ির দাবানল, চলছে সন্ত্রাস, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজ। শিক্ষার সঙ্গে মানব কল্যাণ-এর যে সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই বলেই এমন ঘটছে।

শিক্ষাব্যবস্থা যত সম্প্রসারিত হচ্ছে ততই তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে সেজন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা একান্ড় জর"রি। আর এজন্য সরকারসহ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বশিক্ষা ফোরামে শিক্ষার যে ছয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো—(ক) প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (খ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, (গ) তর"ণ ও বয়স্কদের শিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, (ঘ) বয়স্কদের সাক্ষরতা, (ঙ) জেন্ডার সমতা ও (চ) শিক্ষার গুণগত মানউন্নয়ন।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে, তত শিক্ষার বিস্ড়ার হচ্ছে, কিন্ড়ু পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্ড়ু নয় এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই।'

শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে রোটারি আন্ড়র্জাতিকের একজন প্রাক্তন সভাপতি হার্বার্ট ব্রাউন বলেছেন, 'আমরা শিশু-কিশোর, তর"ণ ও যুবকদের শিক্ষা দিতে পারি সৃষ্টিকে ভালোবাসতে, ভালোবাসতে তাদের গুর"জনকে, ভালোবাসতে তাদের পরিবেশকে, ভালোবাসতে তাদের বন্ধু-বান্ধবকে এবং ভালোবাসতে তাদের পরিবারকে। একইসঙ্গে আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি নিজেদেরকে এবং অন্যকে সম্মান করতে। আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার নিমিত্তে কাজ করতে। আর আমরা যদি তাদেরকে এ বিপ- বাত্মক শিক্ষা দিতে পারি তাহলে এর বিনিময়ে তারা আমাদেরকে উপহার দিবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দরতম পৃথিবী।'

বর্তমানে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে প্রতিযোগিতাশীল এ বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের যেমন প্রয়োজন সুশিক্ষা গ্রহণ করে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা তেমনই প্রয়োজন সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজের মাধ্যমে আন্ড়র্জাতিক সমঝোতা, সৌহার্দ্য ও বিশ্বময় শান্ড়ি স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করা।

একটি কথা না-বললেই নয়, শিক্ষায় যার ভূমিকা মুখ্য তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষককে ইংরেজিতে Teacher বলা হয়। এ Teacher শব্দের প্রতিটি বর্ণ দিয়ে যদি আলাদা শব্দ সৃষ্টি করা যায় তা এমন দাঁড়াতে পারে,

T= Taught (শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী), E = Efficient (সুদক্ষ), A = Amiable (নম্র) C= Counsellor (উপদেষ্টা), H = Honest (সৎ), E = Elite (অভিজাত), R= Reformer (সংস্কারক)। সত্যিকারভাবে যদি শিক্ষকের মধ্যে এসব গুণের সমাহার হয় তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন সার্থক মানুষ। সার্থক মানুষ হিসেবে তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ নিরক্ষর ও দরিদ্র অভিভাবকের সন্ড়ানকে পরিচালনার নৈপুণ্যে, পাঠ-পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের

প্রজ্ঞায় এবং স্নেহ-ভালোবাসার বাৎসল্যে উন্নত মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্য, যদিও শিক্ষককে বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে এ- সমস্যা থেকে উত্তরণ অসম্ভব নয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে মানুষের কল্যাণ বলতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বুঝায়। ধর্ম বলে ইহকাল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু পরকালের শেষ নেই। এর ব্যাপ্তি অসীম। এই অসীম সময়ে শান্তিতে থাকতে হলেও মানব কল্যাণমুখী শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা প্রতিটি ধর্মই মানুষসহ সকল জীবে দয়া করাকে স্রষ্টার সেবা বলে ঘোষণা দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের তরুণ সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হোক সেই শিক্ষা গ্রহণ করা যে শিক্ষায় পার্থিব জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনে, মানুষকে বিবেকবান মানুষে পরিণত করে এবং আমাদের মাতৃভূমিকে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত করে।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় দলীয় সংকীর্ণতা ও হীনম্মন্যতাকে পরিহার করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এনে ছাত্রছাত্রীর উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা প্রদান তথা উন্নত জাতি গঠনে ব্রতী হওয়া।

ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িকতা

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শান্ড়ি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া এবং পৃথিবী থেকে অন্যায় ও অবিচারের চির অবসান ঘটানো। কিন্ড়ু সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, জুরাথাস্ত্র ধর্ম এবং সর্বশেষ ইসলামধর্ম—প্রতিটি ধর্মই স্রষ্টায় বিশ্বাসী হলেও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ধর্মের কর্মপন্থা পরিবর্তিত হয়েছে। কালের পরিক্রমায় মানুষের জীবনযাপন প্রণালিতে মানুষের মেধা, শিক্ষা ও জ্ঞান গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান সময়ে বর্ণে বর্ণে, ধর্মে ধর্মে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বিভেদ তার প্রধান কারণ হচ্ছে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। বিশ্বের সকল ধর্ম প্রচারকই তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন বিশ্ব থেকে অশান্ড়ি দূর করে শান্ড়ি স্থাপনের জন্যে। তারা শত্র" মিত্র সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সকলকে মঙ্গলের পথে আহ্বান করেছিলেন। কাউকে জোরপূর্বক তাদের ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। কিন্ড়ু বর্তমানে মানুষ তাদের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে ধর্মের নামে হানাহানি কাটাকাটিতে মত্ত রয়েছে, যা কখনো কাম্য নয়। কেননা ধর্মে ধর্মে হানাহানি নয় বরং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে পারলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'-এ নীতিবাক্য অনুযায়ী কাজ করলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও সারা বিশ্বে শান্ড়ির সুবাতাস বইতে থাকবে। এজন্য প্রয়োজন ধর্মের মহৎ গুণকে উপেক্ষা না-করে ধর্মের সত্যিকার কল্যাণমুখী কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে ধর্মকে উদ্ধার। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে 'মদিনা সনদ'। এ সনদ সকল ধর্মের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বা জাতিভুক্ত হয়ে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর সেখানকার গৃহযুদ্ধ বন্ধ, শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে এবং অনৈক্য ও অসাম্যের কষাঘাতে জর্জরিত আরব জাতিকে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করার জন্যে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এ সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। এ সনদের ধারাসমূহে বলা হয়েছিল: 'সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, নাসারা এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং সবাই মিলে একটি সাধারণ উম্মাহ (জাতি) গঠন করবে; মদিনা রাষ্ট্রে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমানগণ নির্দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে; কেউ কারো ধর্মে হস্ড়ক্ষেপ

করবে না।' সনদে এ ধারাসমূহ সংযোজনের মূল কারণ এই ছিল যে, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আন্ড়রিকভাবে বিশ্বাস করতেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি না-থাকলে দেশের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই নবী করিম (সা.) মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে বৈঠক করে সর্বসম্মতভাবে এ লিখিত দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের লোকেরা একই সমাজে, একই রাষ্ট্রে কীভাবে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে এ সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) সে শিক্ষাই দিয়েছিলেন মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে।

মদিনা সনদ ইসলামের ইতিহাসে এক গুর"ত্বপূর্ণ ঘটনা। এটা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুর"ত্ব বহন করে। এ সনদ রাষ্ট্রের অন্ড়র্গত সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতার উদাহরণ সৃষ্টি করে সকল প্রকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠন করেছিল। এ সনদ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মীয় উদারতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক জোসেফের মতে, আইনের শাসনের মাধ্যমে শান্ড়ি প্রতিষ্ঠার মহান শিক্ষা পাওয়া যায় মদিনা সনদে। আরব সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত গোত্র প্রথার কারণে যে অরাজকতা বিরাজমান ছিল তার অবসান ঘটাতে গুর"ত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে মদিনা সনদ। এর ফলে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয় অনুশাসন ও আল- াহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে স্বৈরাচারী গোত্রতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনদ ইসলামকে আনুষ্ঠানিকতার গ" থেকে বের করে এনে একটি জীবনবিধানে পরিণত করতে সক্ষম হয় এবং শাসকবর্গের যথেচ্ছাচারের পরিবর্তে সকলের অংশগ্রহণ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার সূত্রপাত ঘটায়। এ সনদ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অক্ষুণ্ন রেখে পাশাপাশি বাস করার উদাহরণ সৃষ্টি করে এবং একটি কল্যাণমূলক, ন্যায়বিচারভিত্তিক, সর্বজনীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। আল কোরান অমুসলমানদের প্রতি যেকোন ধরনের কঠোরতা আরোপ করতে শুধু নিষেধই করেনি অধিকন্ড়ু তাদের প্রতিমাদের গালি দিতেও স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, 'তোমরা ওদের (অমুসলমানদের) প্রতিমাকে গালিগালাজ করবে না, কেননা তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত তোমার আল- াহকে গালিগালাজ করবে (৬:১০৮)। প্রশ্ন হতে পারে তাহলে পবিত্র কোরানের কোনো কোনো আয়াতে কঠোর ভাষায় দেবদেবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে কেন? এর উত্তর হচ্ছে, সাধারণত কোরানে বিতর্ক হিসেবে কোনো সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটা

করা হয়েছে, কারো মনে কোনো অবস্থায়ই কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশে কিংবা অমুসলিমদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্যে এটা করা হয় নি।

নজরানের খ্রিস্টান জনগণের সঙ্গে মহানবী (সা.) যে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন সে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। ইয়ামেনের একটি প্রদেশের নাম হচ্ছে নজরান। খ্রিস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের এ-ছিল এক বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানকার বিশপ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তি করার জন্যে খ্রিস্ট দুনিয়ার প্রখ্যাত ৬০ জন পাদ্রি-পুরোহিতের একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠালেন। তারা যখন মসজিদে নববিতে উপস্থিত হলেন তখন তাদের সান্ধ্য উপাসনার সময়। মহানবীর কাছে তারা উপাসনার জন্য অনুমতি চাইলেন। এদিকে মাগরিবের সময়ও ছিল অত্যাসন্ন। সেজন্যে সাহাবিদের অনেকে মসজিদে নববিতে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের উপাসনা করতে দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুললেন। কিন্তু বিশ্বনবী (সা.) সে আপত্তি কানে না-তুলে মসজিদে নববির অভ্যন্তরেই তাদের প্রার্থনা করার অনুমতি দিলেন। একই মসজিদে বিশ্বনবীর ইমামতিতে কিবলার দিকে ফিরে মুসলমানগণ নামাজে মশগুল হলেন আর একই সময়ে বিপরীত দিকে মুখ করে পাদ্রিরা নিমগ্ন হলেন তাদের প্রার্থনায়। দুনিয়ার ইতিহাসে বোধহয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এরকম নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রতিনিধি দল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে হজরত (সা.) সঙ্গে যে সনদে (চুক্তিতে) স্বাক্ষর করেন তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, 'নজরানবাসীরা প্রতিবেশী হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-এর জিম্মায় থাকবেন। তাদের ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা, তাদের জমি-জমা, ধনসম্পদ সব কিছুই পূর্ববৎ নিজেদের অধিকারে থাকবে। তাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আর যারা অনুপস্থিত সকলের ক্ষেত্রেই এ নীতি কার্যকর হবে এবং প্রতিটি নাগরিক যে অবস্থায় আছেন তার কোনোই পরিবর্তন করা হবে না। গির্জার পাদ্রি-পুরোহিত বা ব্যবস্থাপক যিনি যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় বহাল থাকবেন। তাদের কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না। জাহিলিয়াতের যুগের কোনো রক্তপণ তাদের নিকট চাওয়া হবে না। কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করবে না। তাদের কাছ থেকে উশর (ফসলের এক-দশমাংশ) নেওয়া হবে না।' রাসুলে পাক (সা.)-এর জীবদ্দশায় তো বটেই, তার পরবর্তী সময়েও এ সনদ কার্যকর ছিল।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নবী-রাসুল ও মহামানবগণ সত্য ও শান্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন কিন্তু তাঁরা কখনো জোর-জবরদস্তি বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন নি। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) ন্যায়, সত্য ও শান্তির বাণী প্রচার করায় কোরাইশরা তাঁকে প্রায় তিনবছর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল; তায়েফবাসী তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে ক্ষতবিক্ষত করেছিল অথচ তিনি (সা.) আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা

করেছেন যে: 'হে আল- াহ ওরা না বুঝে আমার ওপর অত্যাচার করেছে, তুমি ওদের শাস্তি দিও না, ওদের ক্ষমা করো এবং ওদের সত্য উপলব্ধি করার শক্তি দান করো।'

বদর যুদ্ধে মক্কার কোরাইশরা মুসলমানদের সঙ্গে চরমভাবে পরাজিত হলে বেদনার গ- ানি মোছার জন্য তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইল। তাই তারা আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসির কাছে এই উদ্দেশে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল যে তিনি যেন আশ্রিত সকল মুসলমানকে তার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেন—যাতে করে মক্কার কোরাইশরা মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন করতে পারে। রাসুল (সা.) তা জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে আমর ইবনে উমাইয়াকে (যিনি ছিলেন একজন অমুসলিম নাগরিক) নিজের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে বাদশাহ নাজ্জাসির কাছে পাঠালেন এবং এই বলে আমরকে নির্দেশ দিলেন যে, আমর যেন মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য রাজদরবারে তাঁর (সা.) পক্ষ থেকে আবেদন করেন। অমুসলমান নাগরিকের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলেই মহানবী (সা.) অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আমরকেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন।

ইসলামে সন্ত্রাস বা বোমাবাজির কোন স্থান নেই। ইসলাম জঙ্গিবাদকেও পৃষ্ঠপোষকতা করে না। শান্তি-সৌহার্দ্য ও মনুষ্যত্বের জয়গানই ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী। হত্যা-সন্ত্রাস-রক্তপাত কিংবা পররাজ্য দখল ইত্যাদি কর্মকান্ডে এক সময় যারা নিজেদের নিয়োজিত রেখে ইসলামের নাম ব্যবহার করেছিল, সেইসব উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজবংশের নীতি আদর্শের ধারা আজও কোথাও কোথাও চালু আছে। আর এসব ইসলাম বহির্ভূত বিকৃত রূপকে অনেকেই ইসলাম হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম প্রবর্তিত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দর্শনের ইতিহাসে এসবের কোনোই সুযোগ নেই। মানবতাবোধ, প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই ইসলামের আবির্ভাব। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজিতে জড়িত হয়ে একে 'জেহাদ' বলে অভিহিত করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। অথচ ইসলামি বিধান অনুযায়ী এসব মানুষ হত্যাকারীর স্থান দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে তাকে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে ও তার ওপর বর্ষিত হবে আল- াহর গজব ও অভিশাপ' (৪:৯৩)। কোনো বৈধ সরকারের আইনি সিদ্ধান্ত ছাড়া বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারে মানুষ হত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম তথা সম্পূর্ণ অবৈধ। পবিত্র কোরানে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন: 'সত্যতা

ব্যতীত মানুষকে তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, কেননা এটা হারাম' (১৭:৩৩)।

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পুণ্যের কাজ। কিন্তু মানুষের বিশ্বজনীনতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে বিশ্বনাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করে এবং এ বিশ্বজনীনতা আঞ্চলিক জাতীয়তার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে। বর্তমান যুগে যেসব জীবনদর্শন আঞ্চলিক জাতীয়তা ও কৌলিন্যগত দম্ভকে লালন করে কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেয় সেসব দর্শনকে ধর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাইয়ের পর বাতিল করে বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর ইসলাম এ বিশ্বজনীনতাকে লালন করেই অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ও শান্তিময় বিশ্ব তৈরি করতে সদা তৎপর।

খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প

এক খরগোশ ও এক কচ্ছপ পরস্পরের বন্ধু। কিন্ডু বন্ধু হলে কী হবে? একের সঙ্গে অন্যের দারুণ প্রতিযোগিতা। খরগোশ সব সময়ই ভাবে: আমি দ্রুতগামী পশু, কচ্ছপ আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় কখনো জয়ী হতে পারবে না। তাই খরগোশ কচ্ছপকে বললো: চলো বন্ধু! আমরা দৌড় দিই। কচ্ছপ রাজি হলো। নির্ধারিত দিনে দৌড় শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই খরগোশ নির্ধারিত স্থানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কচ্ছপটি অনেক দূরে পড়ে আছে। তাই মনে মনে ভাবলো, একটু জিরিয়ে নিই। যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। সে একটি গাছতলায় একটু বিশ্রাম নিতে বসলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খরগোশ ঘুমিয়ে পড়লো। যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কিন্ডু ইতোমধ্যে কচ্ছপটি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়ী হলো।

প্রতিযোগিতায় হেরে খরগোশ তো ভীষণ দুঃখিত। সে ভাবতে লাগলো কীভাবে কচ্ছপকে হারানো যায়। অনেক চেষ্টা করে পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কচ্ছপকে সে রাজি করালো। এবার সে আর আলসেমি করলো না। সে কোথাও বিশ্রাম না-নিয়ে খুব দ্রুত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে কচ্ছপকে অনেক দূরত্বের ব্যবধানে পরাজিত করলো।

এবার কচ্ছপের মন ভালো নয়। প্রথমবার জিতে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার হেরে যাওয়া, সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তাই সে এবার প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান জানালো খরগোশকে এবং বুদ্ধি এঁটে সে এমন পথ বেছে নিল, যে পথের মধ্যভাগে থাকবে এক বিরাট নদী। শুরু হলো দৌড়। নদীর তীর পর্যন্ড় পৌঁছে খরগোশ তো দিশেহারা। কিন্ডু কচ্ছপ তরতর করে সাঁতরিয়ে নদী পাড়ি দিল এবং নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে খরগোশকে হারিয়ে দিল। মনের দুঃখে নদীর তীরে বসে পড়ে খরগোশ, ভাবে কী করা যায়। কচ্ছপ যখন ফিরে এলো তখন খরগোশ বললো : চলো, আমরা প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করি। কচ্ছপ বললো: কীভাবে?

খরগোশ বললো: চলো, আমরা পুনরায় একই রাস্ড়ায় দৌড় দিই। নদীর তীরে গিয়ে তুমি আমাকে তোমার পিঠে নিয়ে নদী পাড়ি দেবে, তারপর আমার পিঠে চড়ে তুমি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

খরগোশের প্রস্ড়াব কচ্ছপের খুবই পছন্দ হলো। তাই তারা প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পুনরায় দৌড়ে অংশ নিলো এবং শর্তানুযায়ী দুজনেই একসঙ্গে গন্ড়ব্যে পৌঁছালো।

যুব সমাজ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার বর্তমান সরকারের প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণায় দেশের মানুষ প্রধানত তরুণ ও যুব সমাজ দিন বদলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ কেমন হবে তা নিয়ে মানুষের কল্পনা ও আগ্রহের শেষ নেই। তরুণ প্রজন্ম বর্তমান সরকারের ভিশন : ২০২১-এর ঘোষণাকে গ্রহণ করেছে সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন হিসেবে। শুধু তরুণদের মাঝেই নয়, দেশের সকল মানুষের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে যে, ডিজিটাল বাংলাদেশে সকল মানুষ দরকারি তথ্য ও সেবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে অহেতুক বিড়ম্বনা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সরাসরি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত পেয়ে যাবে। মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ভবিষ্যৎ ডিজিটাল সরকার হবে অতীতের যেকোন সরকারের চেয়ে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ। যার মূল লক্ষ্য হবে সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক শোষণহীন সমাজ। কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিচার, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যসহ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সকল ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। তবে যতই দুরূহ হোক না কেন তা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কেননা আমরা যুদ্ধ করে, রক্ত দিয়ে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছি। তাই আমরা অবশ্যই এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারব। তবে এজন্য প্রয়োজন যুব সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

যুব সমাজ একটি সমৃদ্ধ জাতির চালিকাশক্তি। তারা তাদের ভালো কাজের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎকে বদলে দিতে পারে। তাই যুব সমাজকে এমন কাজ করতে হবে যার মাধ্যমে দেশের মানুষের মঙ্গল ঘটে। এ কাজ করতে পারলেই তারা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তথা যুব ও তরুণ সমাজকে স্বপ্ন দেখাতে পারছি না। এটা আমাদের ব্যর্থতা। মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন: 'I have a Dream'–আর তাই তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাতে পারি তাহলে তারা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

তারুণ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের বসন্তকাল। এ বয়সে মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং নব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করে। এ বয়সে যদি তাদেরকে শুধু নিজের ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন না দেখে দেশ ও জাতির জন্য স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। দেশ ও সমাজের কল্যাণে তারা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আমাদের দেশের তরুণরাও স্বপ্ন দেখে পরিবর্তনের–স্বপ্ন দেখে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের। স্বপ্ন দেখে ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে যে মতবিরোধ আছে তা চির অবসানের। এসব স্বপ্ন মোটেও অবাস্তব নয়। বর্তমান বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে

যতদূর এগিয়ে গেছে তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এদেশের আপামর জনগণকে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রথমেই যার ওপর গুর"ত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে ICT শিক্ষা। কেননা বিশ্বায়নের এ যুগে ICT শিক্ষা ছাড়া উন্নত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। আশার কথা ইতোমধ্যে আমরা মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্ডু অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। অথচ এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে আমরা অনেক দেশের পূর্বেই ICT প্রযুক্তি ব্যবহার শুর" করেছিলাম। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি দেশ যেখানে ধর্মবর্ণ, গোষ্ঠীনির্বিশেষে সকল মানুষ বৈষম্যহীনভাবে বসবাস করবে এবং যার মূল চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আর এটা হচ্ছে আমাদের জন্য দরিদ্র থেকে ধনী দেশে রূপান্ড়রের একটি সাহসী প্রচেষ্টা।

এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হবে:

১. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সুযোগের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা এবং তড়িৎগতিতে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

২. উন্নত বিশ্বে গড়ে ওঠা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করা।

৩. ডিজিটাল যুগের বাস্ড়বতা অনুযায়ী দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্ড়রিত করা।

৪. দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিকট ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য করা।

৫. সরকার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি নিশ্চিত করা।

৬. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার ও শাসনব্যবস্থার সকল তথ্য ডিজিটালভিত্তিক করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা।

৭. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখাকে যুক্ত করা।

৮. ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা। প্রতিটি শিশুর হাতে কম্পিউটার পৌঁছে দেওয়া এবং প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণ করা।

৯. ভূমিব্যবস্থাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি এর ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

১০. অপরাধ দমনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

১১. গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের কাছে ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য করে তাদের জীবনমান উন্নত করা।

১২. প্রচলিত কাগজভিত্তিক, ফাইল ও ফিতানির্ভর সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে নেটওয়ার্কভিত্তিক পদ্ধতিতে সরকারের সকল কাজ সম্পন্ন করা।

১৩. সামরিক বাহিনীসহ সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ডিজিটাল অস্ত্র ও ডিজিটাল যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ কাজগুলো খুবই কঠিন, কিন্ডু এদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ তর"ণ ও যুব সমাজ যদি চেষ্টা করে তাহলে তা অর্জন কোন অবস্থায়ই অসম্ভব নয়। যদি এ দেশের যুব সমাজকে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সরকারের ভিশন : ২০২১ ফলপ্রসূ হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। তবে এজন্য দেশের সরকার ও সুশীল সমাজের মাধ্যমে তর"ণ প্রজন্মের মধ্যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে তর"ণরা সব সময়ই প্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তাদের মাধ্যমেই সমাজ ও দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। যুব ও তর"ণ সমাজ যেকোন দেশের চালিকাশক্তি। তাই দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ড় জর"রি। তারা সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে এবং তার"ণ্য দিয়ে সমস্যার সমাধানও তারাই করতে পারে। সামাজিক উন্নয়নে তর"ণরা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারাই পারে শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়েপড়া অন্য তর"ণকে মেধাসমৃদ্ধ করে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমি ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্ড়রিত হয়ে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে–এ প্রত্যাশাই আমাদের।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ মদন মোহন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর লে. কর্নেল এম আতাউর রহমান পীর ৮ এপ্রিল ১৯৫০ সুনামগঞ্জ শহরের ষোলঘর মহল- ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরমি কবি শাহ আছদ আলী পীর (র.)-এর প্রপৌত্র। তাঁর পিতা আবদুল মান্নান পীর ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ।

এম আতাউর রহমান পীর সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুল থেকে ১৯৬৬-এ এস.এস.সি, সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে ১৯৬৮-এ এইচ.এস.সি, এম.সি কলেজ থেকে ১৯৭১-এ রসায়ন বিজ্ঞানে অনার্স এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২-এ (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ১৯৭৪) মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহের আঠারবাড়ি কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরবর্তীতে একই জেলার গৌরীপুর কলেজে যোগদান করেন। ১৯৮০ থেকে তিনি মদন মোহন কলেজ, সিলেট-এ রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে যোগ দেন এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োজিত। শিক্ষাবহির্ভূত কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এ (বিএনসিসি-তে) কমিশনপ্রাপ্ত হন এবং ২০০৬-এ লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষক সম্মাননা এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এম আতাউর রহমান পীর রোটারি ক্লাব অভ্ জালালাবাদ-এর সভাপতি এবং রোটারি জেলা-৩২৮০-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও জেলা সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রোভার স্কাউট সিলেট-এর কমিশনার। তিনি মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি সিলেট-এর বোর্ড অভ্ গভর্নরস-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান। সিলেট মোবাইল পাঠাগার, মেট্রোপলিটন ল' কলেজ এবং মেট্রোপলিটন কিন্ডারগার্টেন-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ২০০৬ খ্রি. তিনি সুনামগঞ্জ শহরে শাহ আছদ আলী পীর (র.) ফাউন্ডেশন গঠন করে শাহ সাহেবের নামে চতুর্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তির প্রবর্তক এবং একই বছর জামেয়া হাফিজিয়া দরগাহে শাহ আছদ আলী পীর (রহ.) নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। আল- ামা আবুল হাশিম রচিত দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম তাঁর অনূদিত (২০০৬) গ্রন্থ। ইসলাম : কালজয়ী জীবনাদর্শ তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ। জেনারেল ওসমানী তাঁর সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ।